কিনু গোয়ালার গলি

সন্তোষকুমার ঘোষ

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলকাতা-৭৩

প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ১৯৫০

প্রচ্ছদপট
অঙ্কন—ইন্দ্রনীল ঘোষ
মুদ্রণ—রাজা প্রিণ্টার্স

KINU GOALAR GALI
A novel by Santosh Kumar Ghosh, Published by
Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd., 10 Shyama
Charan Dey Street, Calcutta-700 073

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩ হইতে
এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও নিউ নিরালা প্রেস, ৪ কৈলাস মুখার্জি
লেন, কলিকাতা ৬ হইতে ধীরেন্দ্রনাথ বাগ কর্তৃক মুদ্রিত

মাকে

'কিনু গোয়ালার গলি'র সমস্ত চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক। বাস্তব ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে কোন চরিত্রের সাদৃশ্য যদি থাকে সেটা অনভিপ্রেত ও আকস্মিক।

—লেখক

কিনু গোয়ালার গলি

১

বাস তো সদরে নামিয়ে খালাস ; তারও পর প্রায় দশ মিনিট হেঁটে তবে কিনু গোয়ালার গলি।

প্রথমে পড়ে মহেশ আড্ডি স্ট্রীট্, মোটামুটি সরগরম। কেমিস্ট আছে, ড্রাগিস্ট আছে। আছে হরেকরকম্বা একটা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোর্স। স্টীম লণ্ড্রী, যার নাম 'সর্বশুক্ল'।

আরো এগিয়ে হরিমোহন মুখার্জি রোডের মোড়ে স্কুল। এই স্কুল-বাড়িটাই যা একটু পুরোনো। ফটকের ওপর অর্ধচন্দ্র কাঠের ফলকে নাম ঃ এস. এম. এইচ. ই. স্কুল। পড়ুয়া আর পাড়ার লোক জানে, এস. এম. মানে হ'ল সুরবালা মেমোরিয়াল। নামের নিচে প্রতিষ্ঠা সালেরও উল্লেখ ছিল; সেটা কালে আর জলে ধুয়ে গেছে।

হরিমোহন মুখার্জি স্ট্রীটের চৌমাথার পর থেকে শুরু হল গঙ্গারাম বসাক স্ট্রীট।

বোবা-বোবা চেহারার বাড়ি। ছোট ছোট ফোকরচোখ জানলা আর চুণ-খসা খিলানের হাঁ। টুল-পাতা রেস্তোরাঁর সদাব্রত, সাজো-বাসি ধোবাখানা, তারপর, কী আশ্চর্য, তারপর একটা পার্ক। মরা ঘাস, ভাঙা রেলিং, কাঠা দুই জমি, তবু তো পার্ক। রুদ্ধশ্বাস ইঁটকাঠের মধ্যে একটুখানি অক্সিজেনের আশ্বাস।

আরো খানিক এগিয়ে, দু'তিনটে মোড় ঘুরে, তবে কিনু গোয়ালার গলি। পাশাপাশি চারটে শরীর গলে-কি গলে না এমন গলি। এ-রাস্তা মোটরের মুখ দেখেনি, ট্রাম-বাসের ক্ষীণতম ঘর্ঘরও পার্ক পর্যন্ত এসে মিলিয়ে গেছে ; ছ্যাকড়া গাড়িও ঢুকতে চায় না। কখনো সখনো দু একটা রিক্সা ঢোকে, ঢুকেই পালাই-পালাই করে। সাইকেল অবশ্য চলে, বজ্রসমুৎকীর্ণমণিতে সূত্রের মতো তাদের গতি অবাধ।

কিনু গোয়ালার গলি।

লোনাধরা দেয়ালেতে মাঝে মাঝে ধ্বসে গেছে বালি ; মাঝে মাঝে স্যাঁতা-পড়া দাগ।

কিন্তু এ বর্ণনা তো আপনাদের পড়া।

চৌমাথার ওদিক থেকে যারা মহেশ আড্ডি আর গঙ্গারাম বসাক স্ট্রীট বরাবর গঙ্গাস্নানে যায়, তারা উঁকি দিয়ে হয়ত দেখে কিনু গোয়ালার গলিতে লোকজন চলাফেরা করছে। এ গলিরও তবে প্রাণ আছে !

আছে বৈকি। যদিদং কিঞ্চ সর্বং প্রাণময়ং। কিনু গোয়ালার গলির প্রাণ, সে কি আর চৌরঙ্গীর মতো রঙ্গরসে ভরা হবে। প্রাণ আছে, কিন্তু বাঘ-ভালুকের মতো এমন তেজী নয়, ময়ূরীর মতো নৃত্যপরা নয়, হরিণের মতো

চঞ্চল নয়। আছে কেঁচোর মতো, কোনক্রমে আপন অস্তিত্ব নিয়ে বিব্রত। বুকে হেঁটে চলে, এগোয় কি এগোয় না।

যারা গঙ্গাস্নানে যায়, তারা কি এ গলিতেও লোকজনের বাস আছে বলে অবাক হয়? তা কি আর হয়? তারা নিজেরাও এমনি কোন গলি থেকে এসেছে কিনা তার ঠিক নেই।

কিন্তু গোয়ালার গলি শহরে তো আর একটা নয়।

গঙ্গারাম বসাক স্ট্রীটে তবু বেশির ভাগই ছিল কোঠা-বাড়ি, কিন্তু গোয়ালার গলিতে ঢুকেই খাপরার চালের আর মাটির দেয়ালের ভেজাল শুরু হয়। মাঝে মাঝে খোলা হাইড্রান্টের ফোয়ারা ছোটে; চলতে হলে হাঁটুর ওপর কাপড় তুলতে হয়। ঘোর বর্ষার সময়ে প্রলয় পয়োধি। এই গলিটা শহরের কোন কিছুর অংশীদার হতে পারেনি; না আলো, না বাতাস, না গাড়ি-ঘোড়া দোকানপসার—না বলতে কিচ্ছু না। বর্ষার বখরা পায় ঠিক। নতুন জলে যখন ময়দানের ঘাস সতেজ হয়ে ওঠে, পার্কে সীজন-ফুলের সাত রঙের রামধনু, ঠিক সেই সময় খাটাল ধোওয়া গোবর জল কিন্তু গোয়ালার গলির হেঁসেলে হেঁসেলে ঢোকে।

আবার বাই লেন আছে। তস্য গলি। শীর্ণ হাতের শিরার মতো খাপরার ছাউনির ছায়ায় ছায়ায় চোরা পথে অদৃশ্য পিছল পথ।

২

গলিতে ঢুকেই প্রথমে পোড়া বাড়িতে পাড়ার ছেলেদের জিমন্যাস্টিকের আখড়া, আগে এখান দিয়ে সন্ধ্যার পর একা চলতে নীলার সাহসে কুলোত না। শক্তিচর্চা করছে অথচ ছোকরাগুলোর হ্যাংলামো যায়নি। মেয়ে দেখেছে কি শিস দিয়েছে।

প্রথম প্রথম গা জ্বলে যেত। ইচ্ছে হত এদের কাউকে ডেকে আচ্ছা করে ধমকে দেয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহস করে উঠতে পারেনি। ক্রমশ জ্বলুনি কমল, কৌতুক বোধ এল। আহা, শিস দিয়ে যদি সুখ পায়, পাক। গায়ে তো কিছু ফোস্কা পড়বে না।

তারপর থেকেই শুরু হল ভাড়াটে বাড়ির সারি। একতলার ঘরে ক্যানেস্তারা আর প্যাকিং বাক্সের গুদাম, দোতলার ঘর পিছু এক একটি পরিবার।

স্বল্প পরিসর, স্বল্পতর আলো হাওয়া। প্রথম প্রথম গলি থেকে বড়ো রাস্তায় পড়লে নীলার চোখ ঝলসে যেত।

ব্যায়ামের আখড়ার পর প্রমথর দোকান। প্যারিস জুয়েলারী। প্রোঃ শ্রীপ্রমথনাথ পোদ্দার। নিরালোক ঘুরঘুট্টি ঘরে শিকে ঘেরা দরজার আড়ালে টিমটিমে একটা আলো জ্বালিয়ে প্রমথ পোদ্দার কাজ করছে, দৃশ্যটা প্রথম

প্রথম কেমন অদ্ভুত লাগত। আর, এমন তন্ময় হয়ে মাথা নিচু করে কাজ করে লোকটা, কিন্তু রাস্তায় কারুর পায়ের শব্দ হলে মুখ তুলে তাকায় ঠিক, খুশি হলে আলাপও করে।

সবচেয়ে অস্বস্তি হয়েছিল প্রথম যেদিন যেচে নীলার সঙ্গে আলাপ করল। ঘর থেকে বেরোয় নি। জানালার কাছ ঘেঁসে এসেছিল।

ঘাম ঝরছে, রোমাকীর্ণ নগ্ন বুক, গরাদের ওপরে রাখা কুৎকুতে দুটি চোখ, চ্যাপ্টা নাকটা সামান্য বেরিয়ে এসেছে বাইরে, শুধু জিভটা লক লক করলেই চিত্রটি সম্পূর্ণ হয়। কেমন একটু বিচিত্র হেসে প্রমথ জিজ্ঞাসা করেছিল, 'নমস্কার। আপনারা নতুন বুঝি এ-পাড়ায়?'

অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটুখানি দাঁড়াতে হয়েছিল বৈকি নীলাকে। বলেছিল, 'হ্যাঁ।'

'কোন বাড়ি, ছয়ের এফ?'

'হ্যাঁ।'

'দোতলার কোণের ঘর দু'খানা তো?'

লোকটা সব খবর রাখে, আশ্চর্য।

'আচ্ছা, পরে আলাপ হবে, একপাড়ার বাসিন্দে যখন, হেঁ-হেঁ।'

একটু পা চালিয়েই নীলা চলে এসেছিল, কিন্তু হঠাৎ দাঁতে কাঁকর পড়ার মতো শিরশিরে অস্বস্তিটুকু যায়নি। চোরা কুঠুরির ভেতর থেকে গরাদের ওপর রাখা নাক-চোখ, রোমশ বুক, চিড়িয়াখানায় দেখা মানবেতর কোন প্রাণীর চিত্র মনে পড়িয়ে দিয়েছিল।

পরে অবশ্য নীলা জেনেছিল, প্রমথ আরো কত খবর রাখে। শিকে ঘেরা ঘরখানিতে বসে সোনা চাঁদি ওজন করছে বটে, কিন্তু বাইরের সব খবর জানছে ঠিক। সেই যে কে একজন গণৎকার মেজেয় খড়ি পেতে ভূ-ভারতের সব কিছু বলে দিতে পারত, প্রমথও যেন তেমনি। রৌদ্র গন্ধ শব্দময় পৃথিবীর সব ছায়া ওর ঘরের আয়নায় পড়ছে ঠিক।

বয়স কত প্রমথর? অহরহ ঠাণ্ডা একটা ঘরের প্রায়ান্ধকারে যে নিজেকে বন্দী করে রেখেছে, তার বয়স ঠাহর করা কি অত সহজ। আলোতেও প্রমথকে পরে কয়েকবার নীলা দেখেছে; করকোষ্ঠীর মতো প্রমথর কপালময়, চোখের কোণে, অগুনতি রেখা। সব বয়স ওই রেখার জালে ঢেকে গেছে, আটত্রিশ না আটান্ন বোঝবার সাধ্য নেই।

প্রথম আলাপের কয়েক দিন পর প্রমথ নিজেই এসে নীলার বাবার সঙ্গে আলাপ করে গিয়েছিল।

চা নিয়ে এল নীলা।

'আমার মেয়ে।' বললেন শিবব্রতবাবু।

চায়ের বাটিতে চুমুক দেবার সময় চুক চুক একটা শব্দ হয় প্রমথর—নীলা লক্ষ্য করলে।

প্রমথ বললে, 'আমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে। মা লক্ষ্মীকে আমি ইস্কুলে যেতে আসতে দেখেছি।'

'ইস্কুলে না, কলেজে। সেকেণ্ড ইয়ার।' বাবা বললেন।

'ওই হল। সেকালের ছাত্তরবিত্তি ফেল মশাই, আমার কাছে কিবা ইস্কুল, কিবা কলেজ।'

হাসি চাপতে চাপতে অন্য দিকে মুখ ফেরাল নীলা।

প্রমথ আবার বললে, 'অন্ধকার কুঠুরিতে থাকি মশাই, কিন্তু দেখতে পাই সব। এ-পাড়ায় কোন কিছু আমার অগোচর হবার যো নেই।'

নীলা ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তবু প্রমথর শেষ কথা ওর কানে এল : 'এত বড় মেয়ে ঘরে রেখে পড়াচ্ছেন, আপনার সাহস আছে। আগেকার কালে হলে কোন্ কালে বিয়ে হয়ে যেত।'

কান দুটো ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল নীলার। এই শিক্ষাহীন রুচিহীন লোকটার সঙ্গে বাবা কী এত কথা বলছেন!

সারি সারি ঘর। ঘরে ঘরে তালা। ভাড়াটে শুধু নীলারা।

'জানিস, বাড়িটা বনেদী—এর একটা ইতিহাস আছে।' প্রমথ চলে যাবার পর শিবব্রত বলেছিলেন। নীলা হেসেছিল শুধু। ইতিহাস আছে। অর্থাৎ অতীত। যাদের বর্তমান নেই, শুধু তাদেরই ইতিহাস থাকে, অন্তত শুধু তারাই ইতিহাসকে মনে রাখে।

যেমন শিবব্রতবাবু। নীলার বাবা।

পপ্‌লার পার্ক থেকে ছিটকে এসে পড়েছেন কিনু গোয়ালার গলিতে, কম রাস্তা তো নয়। একেবারে খাড়া ঢালু রাস্তা। মাঝখানে বছরখানেক ব্রেক জার্নি গেছে ভবানীপুরের সেই ভাড়াটে বাসায়, তারো পরে মাসখানেক বৌবাজারের বাড়িতে। কোথাও টেঁকা যায় নি। পা পিছলে পিছলে চলে এসেছেন এই কানা গলির কোটরে, দোতলার সিঁড়ির পাশের দুখানা মাত্র ঘরে, সপরিবারে।

পপ্‌লার পার্কের দিনগুলো আস্তে আস্তে কেমন ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। মাঠ শেষের হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়া আকাশের মতো। অনুভূতিতে নেই, স্মৃতিতেও থাকবে না আর কিছুদিন পরে।

অনেক অনেক বছর আগে, বেণী দুলিয়ে যে মেয়েটি নিজেদের গাড়ি করে ইস্কুলে যেত, আজকের আধ-ময়লা শাড়ি ড্রেস করে পরা শীর্ণকপোলার মধ্যে তার স্মারক অভিজ্ঞান কী আছে! ভবানীপুরের বাসাতেও কলেজের বাস আসত। এখানে এসে অবধি পায়ে হেঁটেই চলছে; ক্বচিৎ কখনো ট্রামে।

প্রথম যখন এসেছিল তখন বাড়ির চেহারা দেখে অন্তরাত্মা শুকিয়ে গিয়েছিল। আর কী বিশ্রী গন্ধ রাস্তায়। নাকে কাপড় দিয়ে চলতে হত। কে জানে, রাস্তার পাশে চোরকুঠুরিতে বসে প্রমথ পোদ্দার মনে মনে হেসেছে কিনা। হয়ত ভেবেছে, এখন নাকে কাপড় দিচ্ছ' দাও। কিন্তু ক' দিন! প্রথম প্রথম দু'চারদিন সবাই এ-পাড়ায় এসে অমন নাকে কাপড় দেয়। তারপর আস্তে আস্তে সব অনুভূতিগুলোর মতো ঘ্রাণেন্দ্রিয়ও নির্জীব হয়ে আসে; টেরও পাওয়া যায় না।

সদরের চৌকাঠ পেরিয়ে একটা বড়ো উঠোন অতিক্রম করতে হয়, তার একটা খিলানের নিচে দিয়ে অন্ধকারতর প্যাসেজের শেষে সিঁড়ি।

এই পথটুকু আসতে আগে কী ভয়ই না ছিল! পায়ের শব্দে দেয়ালে প্রতিধ্বনি উঠত, চত্বরের মোটা থামগুলোর চার পাশে চামচিকে উড়ত। সেকালে শখের বাড়ি, এটা ছিল বুঝি নাট-মন্দির। এ-পাড়ার আদি অধিবাসী যে প্রমথ, তাকে জিজ্ঞাসা করলে জানা যেত এই সেদিনও নাট-মন্দিরে প্রতি সন্ধ্যাবেলা কতকথা হয়েছে। পুজোর সময়ে এই উঠোনেই বাঁধা হয়েছে স্টেজ। চার পাশের বারান্দা ঘিরে পড়েছে চিকের পর্দা।

তারপর বসাকবাবুদের নিজেদের মধ্যে শরিকানার বিবাদ লাগল। শেষ পর্যন্ত ভাগের মার পুজো পাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হল।

তারো পরে কিছুদিন এখানেই ছোটবাবুরা শখের ব্যাডমিন্টন খেলার কোর্ট করেছিলেন। ঝাড় লণ্ঠন সরিয়ে চড়া পাওয়ারের বিজলী আলোও বসেছিল। তাও কবে বন্ধ হল। বসাকবাবুরা কে কোথায় ছিটকে চলে গেলেন একে একে। দরজায় দরজায় কুলুপ পড়ল। উঠোন চিড় খেয়ে গেল, নাট-মন্দিরের থামের মাথায় বাসা করার অধিকার নিয়ে চামচিকে আর চড়ুয়ের মধ্যে শুরু হল চিরকালের কলহ। এদিকে দেয়ালের কলি ফেরে না, আস্তর খসছে একে একে, জানালা দরজার কাঠ হাওয়ার সাড়া পেলেই কাঁপে।

আরো লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বাড়িটা বসে যাচ্চে ধীরে ধীরে। গোটা বাড়িটা বসছে কিনা, তা চট করে বোঝবার উপায় নেই, কিন্তু বসছে সন্দেহ কি। সদর চৌকাঠ থেকে উঠোনটা এরি মধ্যে দু' তিন ইঞ্চি নীচু। এক একটা বর্ষা যায়, উঠোনে শ্যাওলা গজায়, চিড়-ধরা দেয়ালে ক্লিষ্ট সবুজ একটুখানি অশথগাছের চারার সাড়া মেলে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়িটাও বসে যায় একটু একটু। পৃথিবীর অভ্যন্তরে হয়ত এই বয়োজীর্ণ ইঁট-কাঠ-চূণ-শুরকি-গুলোর জন্য চমৎকার একটি সমাধি তৈরি হয়ে আছে।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে নীলা অবাক হল। সিঁড়ির ঠিক নিচে, কোণের ঘরখানার ভেতর থেকে আলো আসছে। এই তো ছ'মাস হয়ে গেল এখানে এসেছে, ওদের ঘর ছাড়া আর কোন ঘরে কখনো আলো দেখেছে বলে মনে পড়ল না; কী ব্যাপার ভাবতে ভাবতে নীলা ওপরে উঠে এল।

ঘরের মাঝখানে পর্দা ঝোলানো পার্টিশন। ভেতরের অংশটা অন্তঃপুর। মেজেয় অনন্তশয্যায় মা শুয়ে। হাঁপানির কষ্ট।

'কেমন আছ মা।' কাপড় ছাড়তে ছাড়তে নীলা জিজ্ঞাসা করলে।

প্রত্যুত্তরে, নিভাননী একটুখানি হাসলেন। অর্থাৎ কষ্টের এখন কী। আসল কষ্ট তো শুরু হবে শেষ রাত্রে।

'একতলার ঘরখানায় আলো জ্বলছে যেন দেখলাম মা।'

'তাই নাকি।' নিভাননী ক্ষীণকণ্ঠে জবাব দিলেন, 'নতুন কোন ভাড়াটে এসেছে হয়ত।'

হারিকেনের আলো উসকে দিয়ে নীলা বইখাতা খুলে বসল। জানালার কাছে মাদুর পাতা। সামনে জলচৌকি। সেইটাই টেবিলের কাজ করছে।

'পড়তে বসলি নাকি?' মা জিজ্ঞাসা করলেন।

নীলা লজিকের বই খুলে একটা ফ্যালাসির রহস্য উন্মোচন করতে শুরু করেছিল, বললে, 'হুঁ।'

'ওমা, ধুনো দিবিনে, লক্ষ্মীর পটের সামনে আলো জ্বালবিনে?'

ঘাড় ফেরাল নীলা। 'কেন বৌদি নেই?'

'জানিনে বাছা। খোকা অফিস থেকে এসেই ওকে নিয়ে কোথায় গেল।'

ওঃ বেড়াতে বেরিয়েছে। নীলার কপালে গোটাকয়েক কুঞ্চিত রেখা পড়ল। বইপত্র বন্ধ ক'রে উঠে দাঁড়াল। আজকের মতো পড়া এখানেই ইতি।

বাড়ি এসেই কাপড় ছেড়েছিল, এবার তার চেয়েও খেলো একটা শাড়ি তাড়াতাড়ি পরে নিল নীলা। একটু আধটু ছেঁড়া, হলুদের দাগ এখানে ওখানে। উনুনে আঁচ দিল। চাল ধুয়ে চড়িয়ে দিল হাঁড়িতে, তারপর এক-দৃষ্টে অনেকক্ষণ উনুনের ধোঁয়ার দিকে চেয়ে রইল।

হঠাৎ পিছনে কার ছায়া পড়তে নীলা ফিরে তাকাল। তারপর পলক পড়ল না অনেকক্ষণ।

কৃশ লম্বাটে ধরনের একখানা মুখ, পরণে সাধারণ রঙীন একটা শাড়ি, পরবার ভঙ্গিতে অসামান্য রুচি। আধমাথা ঘোমটা। রঙ? চট-টাঙানো রান্না-ঘরের কুপির আলোয় সেটা ঠিক বোঝা গেল না।

কৃশ মুখখানির ঠোঁট দুটি একবার নড়ে উঠল, 'আপনাদের বাড়তি এক-খানা থালা আছে ভাই, দেবেন একটু? আমরা নিচের তলায় নতুন ভাড়াটে এসেছি। এখনো জিনিষপত্র নামানো হয়নি।'

বিনাবাক্যে নীলা একটা থালা এগিয়ে দিল। তরতর করে নতুন বৌটি নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে। হঠাৎ নীলার খেয়াল হল, তাই তো, দুটো কথা জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল বৌটিকে, বসতে বলা উচিত ছিল। নতুন এসেছে, হয়ত আলাপ করতেই এসেছিল, থালা চাওয়াটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। তাই তো, বড় অভদ্রতা হয়ে গেছে।

নীলা ঠিক করলে কাল সকালে গিয়েই বৌটির সঙ্গে আলাপ করে আসবে।

গিয়ে আলাপ করতে হল না। পরদিন সকালে মুখ ধুতে নিচে গিয়ে কলতলাতেই বৌটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

রাতে একবারের জন্যে দেখা হলে হবে কী, বৌটি নীলাকে চিনে রেখেছিল ঠিক।

'নমস্কার', দু'হাত তুলে বৌটি বললে। 'এই বুঝি আপনার ঘুম ভাঙলো ভাই?'

'না', হাই তুলে নীলা বললে, 'অনেকক্ষণ ভেঙেছে। আপনার স্নান হয়ে গেল?'

'হ্যাঁ ভাই। তাড়াতাড়িই সেরে নিলাম। বাথরুম নেই, খোলা কল-চৌবাচ্চা, সবাই উঠে পড়লে চান করতে অস্বস্তি হবে।'

'নতুন নতুন', নীলা বললে, 'সকলেরই হয়; আমাদেরও হত। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে।' বলে একটুখানি হাসল। যেন এ-বাড়িতে ঘেরা বাথরুমটুম না থাকার লজ্জা নীলার।

কাচা জামাকাপড় হাতে তুলে নিলে বৌটি, আরেক হাতে ছোট একটা বালতি ভর্তি জল নিলে।—'চলি ভাই। আসবেন না আমাদের ওখানে একটু পরে—ও আপনার তো বুঝি আবার কলেজ আছে।'

নীলা বললে, 'কী ক'রে জানলেন ?'

মৃদু মৃদু হাসল বৌটি। 'সব খবরই রাখি যে। কাল দুপুরে এ-বাড়ি এসেছি। বিকেলেই আপনার বাবার সঙ্গে আলাপ করেছি—উনি তখন বুঝি বেড়াতে যাচ্ছিলেন। আপনার নাম তো নীলা, না ?'

নীলা ঘাড় নাড়লে।

'কই আমার নাম তো জিজ্ঞাসা করলেন না।' বৌটি একটু অপেক্ষা ক'রে থেকে বলল, 'আমার নাম শান্তি।'

একটা কিছু বলতে হয়, তাই নীলা বললে, 'বেশ নাম।'

'ছোট্ট—কিন্তু একটু সেকেলে, না ?'

'কই আর সেকেলে।' নীলা যেন সান্ত্বনা দিলে।

আর সঙ্গে ক্ষোভের একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললে বৌটি।—'আর নাম—মেয়েমানুষের আবার নাম। ও-নাম কবে ধুয়ে মুছে গেছে।'

'ধুয়ে মুছে গেছে ? কেন ?'

হাতের জলের বালতিটা রেখে শান্তি কোমরের কাছে শক্ত ক'রে বাঁধা আঁচলটা খুলে কপালটা মুছল। তারপর অবাক গলায় বললে, 'ওমা, যাবে না ? আপনি এখনো কুমারী, ইস্কুল কলেজের খাতায় আসল নামটাই লেখা আছে, সেই নাম ধরেই সবাই ডাকছে, তাই বুঝছেন না। বিয়ে হয়ে গেলে বুঝতেন। কে ছিল কবে শান্তি, কে মনে রেখেছে ? আমি এখন শুধু মণিবাবুর বৌ—একটু গাল ভরে বলতে গেলে মণীন্দ্রবাবুর স্ত্রী—বিলিতি কায়দায় মিসেস সান্যাল। উনি বিয়ের পর প্রথম প্রথম শান্তি বলেই ডাকতেন। আজকাল উনিও আমার নামটা ভুলে গেছেন মনে হয়।'

বেলা একটার সময় ক্লাশ। কলেজ যাবার মুখে নীলা একবার নিচের ঘরে উঁকি দিলে। দেখলে, শান্তি জানালার ধারে বসে কী একটা বুনছে। নীলাকে দেখে বোনা বন্ধ করে বললে, এসো ভাই। কলেজে চললে ?'

তুমির অন্তরঙ্গতাটুকু নীলার কান এড়াল না। কিন্তু জবাবে তুমি বলতে বাধল। হাজার হলেও শান্তি বিবাহিতা, কপালে সিঁদুর, মাথায় ঘোমটা—বয়সেও হয়ত কিছু বড়ো।

চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়েই নীলা জবাব দিলে, 'হ্যাঁ। আজ আর বসব না,

সময় নেই। আপনাদের রান্না খাওয়া সব শেষ ?'

'রান্না হয়নি তো ভাই।'

'হয়নি ? সে কি ?'

'আমাদের খাবার হোটেল থেকে আসে। উনি সেই সকালে বেরিয়েছেন, এখনো ফেরেন নি।'

'ওমা—এত বেলা অবধি না খেয়ে আছেন ?'

'কই আর তেমন বেলা হয়েছে ? উনি এসে পড়লেন বলে।'

বলতে বলতেই মস মস জুতোর শব্দ পাওয়া গেল। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা লম্বা চুলওয়ালা এক ভদ্রলোক কোনদিকে না তাকিয়ে সোজা ঘরে এসে ঢুকলেন। হাতে কিছু চীনেমাটির বাসনপত্র, আরেক হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার।

নীলা সরে দাঁড়াল। শান্তির সঙ্গে চোখাচোখিও হল একবার। শান্তি মাথায় ঘোমটা টেনে দিয়েছিল। নীলার জিজ্ঞাসু চোখের জবাব ঘোমটার নিচে থেকে চোখ দিয়েই দিলে। নীলা বুঝল ইনিই মণীন্দ্র সান্যাল! শান্তির স্বামী।

৩

তাড়াতাড়ি বাস থেকে নামতে গিয়ে স্যাণ্ডালে শাড়ির পাড় জড়িয়ে গিয়ে থাকবে, কোনক্রমে হোঁচট খেতে খেতে নীলা বেঁচে গেল। কিন্তু মাথা তুলতে মাথা কাটা গেল। ঐ চৌরাস্তায় অন্তত হাজার জন দেখেছে। গায়ে-পড়া সহানুভূতি আর দূরে দাঁড়িয়ে টিট্‌কিরি, দু'টোই অসহ্য। একটা বই আর গোটাদুই খাতাও ছিটকে পড়েছিল, কে একজন এসে সামনে তুলে ধরল: 'মাপ করবেন, এগুলো আপনার।'

নীলারই। কিন্তু জবাব দেয় কে। কোনক্রমে বইপত্র সামলে যখন গলিতে এসে ঢুকল তখনো পা কাঁপছে। ছি ছি ছি। আরেকটু সাবধান হয়ে চলাফেরা করে না কেন।

'এই-যে, মা লক্ষ্মী। শাড়িটা ছিঁড়লে কী ক'রে ? পড়ে গিয়েছিলে বুঝি।' প্রমথ পোদ্দারের গলা। তাড়াতাড়ি বুক থেকে পা অবধি ত্রস্ত দৃষ্টি বুলিয়ে নিতে গিয়েই নীলা দেখতে পেল গোড়ালির ঠিক ওপরে, পাড়ের কাছ ঘেঁসে, অনেকখানি ছিঁড়ে গেছে। আশ্চর্য, প্রমথর চোখে কি কিছুই এড়ায় না। যদিও পেটিকোট আছে, তবু প্রমথ এখনো ওর কুঠুরি থেকে চেয়ে আছে ভাবতেই নুয়ে পড়ল নীলা। কোনক্রমে এই পথটুকু ফুরোলে বাঁচে।

চৌকাঠ পেরুতেই অন্যদিনের চেয়ে আজকের স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ে। ইণ্ডিপুরু ধুলো আর জঞ্জালে ভর্তি উঠোনটা আজ যেন ঝক্ ঝক্ করছে। অন্ধকার খিলানটার নিচে ঢুকতে আজ ঝুলে আঁচল জড়িয়ে গেল না। উঁকি দিয়ে দেখল, শান্তি ঝাঁটা হাতে কলতলায় শ্যাওলা সাফ করছে। চোখাচোখি

হতে হাসি বিনিময় হল, কথা হল না।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠেই প্রথম ঘরখানা দাদা-বৌদির। আজ বোধহয় ওরা বেরোয়নি। কাল বাইরে থেকে শেকল লাগান ছিল, আজ ভেতর থেকে ভেজানো। বোধহয় গল্প করছে।

নিজের ঘরে ঢুকতেই মার ককানি কানে এলো। 'কে, নীলি এসেছিস? আমাকে এক গ্লাস জল দিবি?'

'তোমার আজ বুঝি জ্বরটা বেড়েছে মা?'

প্রত্যুত্তরে মা কিছুক্ষণ ধরে কাশলেন। তারপর একটা অনিচ্ছুক স্তরের সারমেয়কে গলায় শিকল বেঁধে টেনে নিয়ে যাবার মতো কণ্ঠে বললেন, 'সেই বিকেল থেকে। কখন থেকে তেষ্টা পেয়েছে—'

মাকে জল ভরে এনে দিলে নীলা। বিরক্ত গলায় বললে, 'কেন, তোমার বৌ তো ছিল। তাকে বলতে পারনি?'

পুরো গ্লাসটা নিঃশেষ করে পাশ ফিরতে ফিরতে নিভাননী ক্লান্ত স্বরে বললেন, 'বৌ কি এ-ঘরে ছিল নাকি!'

জামাকাপড় বদলে পোষাকি শাড়িটাকে অনেকক্ষণ ধরে পাট করে রাখাল নীলা। ঈস্ বড্ড ছিঁড়েছে, রিপু চলে কিনা ঠিক নেই। শাড়িটাকে সে যত্নে ভাঁজ করে তোষকের নিচে চাপা দিলে। বাইরে বেরুবার এই এক এবং অদ্বিতীয় শাড়িই তো আছে। আর সব বিলাসকে নিরবশেষভাবে ছাঁটাই করেও এখনো একটুখানি বাকি, বাইরে যাবার জন্যে চলনসই একখানা শাড়ি অন্তত চাই; আর, কলেজে যখন পড়ছে, এটাও কি একটা বিলাসিতা, অন্যমনস্ক ভাবে চুলে চিরুণী চালাতে চালাতে নীলা ভাবলে।

একটু পরেই অমিতা এ-ঘরে এল। ফোলা ফোলা চোখ, ফাঁপানো চুল, এসেই এদিক ওদিক তাকাতে শুরু করল। কী খুঁজছে যেন। নীলা স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে আছে দেখে অপ্রতিভ হেসে বলল, 'এই যে ঠাকুরঝি, কখন এসেছ।'

সারা দুপুর-বিকেল ট্রাম-বাস, কলেজ-কমনরুম করলে মেজাজ এমনিই বিগড়ে থাকে।

সোজাসুজি জবাব না দিয়ে নীলা বললে, 'তুমি কী খুঁজছ বৌদি?'

'একটুখানি দুধ, ভাই। কাল থেকে বড্ড সর্দি হয়েছে। একটু চা খাব। দুধ কোথায় থাকে, ভাই?'

'তুমি এ বাড়ির বৌ, দুধ কোথায় থাকে জানো না?' কঠিন সুরের সঙ্গে একটু তিক্ত হাসির ঝাঁঝ মিশিয়ে নীলা বললে।

আঁচলে গোটা দুই হাঁচি সংবরণ করে অমিতা যেন ওর ঠাণ্ডালাগার সত্যতা প্রমাণ করতে চাইলে। একটু অভিমান, একটু আবদারের সুরে বললে, 'বড্ডো সর্দি করেছে যে ভাই।'

'ওই কোণে দুধ আছে, নাও। মার বার্লি'র সঙ্গে একটু দুধ মেশাতে হবে, সবটা নিও না। দাদারও বোধ হয় সর্দি করেছে, দাদাও বোধ হয় চা খাবে?'

'তোমাদের বাড়িতে এলে কারুর বুঝি অসুখও করতে নেই ঠাকুরঝি', দুধ নিয়ে যেতে যেতে অমিতা বলল, 'নেহাৎ আমার কাকা এসেছেন, তাই। নইলে আমার সর্দির জন্যে দুধ চাইতে আসতাম না।'

নীলা একটা জবাব দেবে মনে করে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়েছিল অমিতা। তারপর যেন কতকটা হতাশ হয়েই আবার বললে,—'নিজেরা যেমনই থাকি, বাপের বাড়ির লোকের কাছে একটু সেরেসুরে চলতে হয় ঠাকুরঝি—নইলে'

নীলা অমিতার শেষ কথাটা শুনতে পেল না।

আশ্চর্য, এ বাড়িরও ছাত আছে; সেই ছাতে ওঠাও যায়। গঙ্গাজলের কলতলা আছে দোতালায়, তার পেছন দিয়ে কাঠের সিঁড়ি, একেবারে খোলা আকাশের সীমানা ছুঁয়ে তার শেষ!

এখানে উঠলে শুধু শহরের কোলাহলই কানে আসে না, নিজের নিভৃত মনেরও কল্লোল শোনা যায়। হর্ম্যতরঙ্গে বাধা পেয়ে চোখ শুধু ঠিকরে ফিরেই আসে না, মাথা তুলে ওপরেও তাকানো চলে; সেখানে আকাশের মমতা-স্নিগ্ধ নীল। আর আছে মাঝে মাঝে ঝিরঝিরে হাওয়া। এই গলিটা কিনু গোয়ালার হতে পারে, এই ছাতটা নয়। মুক্তির এই খোলা আঙিনায় গোটা শহরই একাকার। শুধু শহর কেন, এই হাওয়ার হাত ধরে শহরের সীমানা পেরিয়ে নদীর স্রোত ধরে ধরে বুঝি পৌঁছানো যায় দিশাহারা সাগরে, কিম্বা উত্তরের পূর্বপারে উধাও পাহাড়ে। এই ছাতের জ্যামিতি জরিপ নেই।

বৌদির সঙ্গে সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া করে এসে এখন যেন মন খারাপ হল নীলার। ছি ছি। এত তুচ্ছ বিষয়েও মাথা বিগড়ে যেতে পারে মানুষের, এত সামান্য ব্যাপার নিয়েও কথা কাটাকাটি হতে পারে। নীলার নিজেরও তো শরীর খারাপ—সেও বরং ও-ঘরে যেতে পারত, অমিতার কাছে আদা মেশানো এক পেয়ালা চা চাইলে সে বরং খুশিই হ'ত। তবে?

অমিতার প্রতি তার এই বিরূপতার কারণ অন্যত্র, নীলার মনে হ'ল তার, বাবার, মার, একমাত্র দাদা ছাড়া এ-পরিবারে আর কেউ প্রসন্ন মনে গ্রহণ করতে পারেনি অমিতাকে। স্বাঙ্গীকরণের মধ্যেও কোথায় যেন অপছন্দের কাঁটা বিঁধে আছে। আর অমিতাও যেন সেটা বুঝতে পেরেছে। সেও সরে যেতে চাইছে। কিন্তু একলা যাবে না, দাদাকে নিয়ে যাবে।

মা-বাবার বিরূপতার কারণ নীলা জানে। এ পরিবার যখন চরম দুর্দৈবের দিনে পা পিছলে গড়িয়ে পড়ছে—পপ্‌লার পার্ক থেকে ভবানীপুর, ভবানীপুর থেকে বৌবাজার, সেখান থেকে কিনু গোয়ালার গলি—তখন ওঁরা চেয়ে ছিলেন দেবব্রতর দিকে। উপযুক্ত ছেলে, সে যদি পারে এই অধোগতি ঠেকাতে। কিন্তু পারল কই। সামান্য একটা চাকরি সংগ্রহ করল বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় সেটা যেন কৌপীন কিম্বা কটিবাস।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দাদা বিয়ে করে নিয়ে এসেছে অমিতাকে। অমিতা

সেই পরিবার থেকে এসেছে, যাদের এখনো সর্বস্বান্তির মধ্যে শান্তির উপাদান খুঁজতে হয়নি।

কিন্তু দেবব্রত? সে তো এ পরিবারেরই ছেলে। সে কেন বদলে যাচ্ছে। ময়ূরীর চিত্তরঞ্জনের জন্যে ময়ূরের পেখম আর নৃত্য,—কিন্তু তাই বলে স্ত্রীর জন্যে মানুষকেও কি বইতে হবে স্নবারির পুচ্ছ, নির্লজ্জ নৃত্য করতে হবে চিত্ত বিনোদের জন্যে? এ-বাড়ির চৌকাঠ দিয়ে ঢুকতে দাদার মাথা হেঁট হয়ে আসে। শ্বশুর বাড়ির লোকজনদের কাছে নিজেকে এ-বাড়ির একজন বলে পরিচয় দিতে ওর মাথা কাটা যায়। আর, নীলা এ-ও মনে মনে জানে, দাদা এ-বাড়ি থেকে পালাতে চায়। এ-বাড়ি ও আর সইতে পারছে না; এই দৈন্য; এই ধোঁয়া; এই শ্বাসরোধ।

ও যদি পারেও, অমিতা পারবে না। ওর বাবার টাকা আছে। কাকারা বিজনেস-কৃতী, মামারা চাকরিতে। জামাইকে ওঁরা টেনে তুলবেনই। আর দাদাও তৈরী হয়েই আছে। তেলাপোকা এখন কাঁচপোকা হবার একাগ্র সাধনায় তন্ময়।

এমন নয় অমিতার খুব দেমাক। প্রথম আলাপে তো মনে হয়েছিল অমায়িকতার মাখনবাটী। কিন্তু তবু যেন সহজ হতে পারেনি, কোথায় একটা পার্থক্য রেখেছে। ওর সঙ্গে যখন হেসে কথা কইতে চেষ্টা করে অমিতা, তখন ঠোঁট দুটি বিস্তৃত হয় শুধু, হাসি ফোটে না। সংসারের কাজ যেটুকু করে, অত্যন্ত আনাড়িভাবে। হয়ত চা তৈরী করতে গিয়ে প্লেট ভেঙেছে, উনুন ধরাতে গিয়ে হাতে ফেলেছে ফোসকা।

প্রথম প্রথম মজা পেয়েছে নীলা। অমিতার আনাড়িপনায় হেসেছে। কিন্তু কিছুদিন যেতে কেমন সন্দেহ হয়েছে, এ আনাড়িপনা স্বাভাবিক নয়, এর নিচেও আছে নিপুণ অভিনয়ের ছুরি। সুকৌশলে যেন অমিতা বোঝাতে চাইছে নিজের হাতে চা তৈরী করা বা উনুন ধরানোর অভ্যাস ছিল না তার, শুধু এ-পরিবারে এসেই—

বধূবরণের দিনটি নীলার মনে আছে। বাসা তখন বৌবাজারে। সে-ও জীর্ণ বাড়ি। মোটর ঢোকে না সে গলিতে। সদরে গাড়ির হর্নের প্রতিধ্বনি উঠল অন্দরের শঙ্খরবে।

দাদা বৌদি ঘরে এসে বসলেন। হাসিঠাট্টা হল একটু-আধটু। কিন্তু জমল না। নীলা এ-কালের মেয়ে, এ-সব আচরণ বিশেষ জানা নেই। সব চেয়ে বেশী অস্বস্তি হচ্ছিল নতুন বৌয়ের অস্বস্তিবোধ দেখে। সেই যে তখন থেকে এসে বসে আছে মাথা নিচু করে, এখন পর্যন্ত মুখ তোলেনি অমিতা; মুখ ফোটেওনি।

পাড়ার মেয়েরা রণে ভঙ্গ দিল। মা কৃতার্থ ভঙ্গিতে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে। নীলা তাকে আড়ালে ডেকে নিলে। জিজ্ঞাসা করলে নিচু গলায়, 'বৌ কথা বলছে না কেন মা?'

'বোধ হয় বড়ো লাজুক। মা-বাপ সবাইকে ছেড়ে এসেছে, সে জন্যেও

বোধ হয় মন খুব খারাপ হয়ে আছে।'

সেই মুহূর্তে কী হয়েছিল নীলার, কঠিন গলায় বলে উঠেছিল, 'বোঝ না যখন মা, তখন চুপ করো। আসলে তোমার বৌয়ের মন ওঠেনি।'

নিভাননী শুকনো-গলায় বলেছিলেন, 'মন ওঠেনি কি রে। দেবুকে ও তো পছন্দ করেই বিয়ে করেছে।'

'আঃ মা,' বিরক্ত গলায় নীলা বলেছিল, 'তুমি কি কিছুতেই বুঝবে না? বর পছন্দ হয়েছে তোমার বৌয়ের, কিন্তু ঘর পছন্দ হয়নি। এই ছোট্ট বাসা, আলো নেই, হাওয়া নেই, এসেই ও কেমন হাঁপিয়ে উঠেছে। দেখতে পাও না?'

'নীলি, একবার নীচে আসবি?'

চমকে পিছন ফিরে তাকাল নীলা। চোরের মতো দাদা কখন এসে পিছনে দাঁড়িয়েছে টের পায়নি। লোকে কাচের বাসনে যেমন করে হাত দেয়, তেমনি সন্তর্পণে নিচু গলায় দেবব্রত বলছে, 'একবার নিচে আসবি? কাকা তোকে ডাকছে।'

দেবব্রতর চুল পরিপাটি আঁচড়ানো, গায়ে ধবধবে গেঞ্জি, তবু ওর চেহারা দেখে হাসি পেল নীলার। বৌদির সঙ্গে মাথা নিচু করে কথা কইতে কইতে ভাবে ভঙ্গিতে এমন একটি দাস্যভাব এসেছে দাদাটার চলতি বাংলায় যার তর্জমা হতে পারে ভীরু-ভীরু, বোকা-বোকা।'

'কাকা কে?' ভ্রূ তুলে জিজ্ঞাসা করল নীলা।

'কাকা—মানে ওর কাকা—তোর বৌদির। অবিনাশবাবু। মনে নেই?' ধমক খেয়ে আরো যেন কথা জড়িয়ে গেল দেবব্রতর।

'ও। তা আমাকে ডাকছেন কেন?'

'গান শুনতে চাইছেন। শুনেছেন কিনা তোর গলার প্রশংসা।'

'এ-বাড়ি এসে তোমার শ্বশুরবাড়ির লোক তো কেবল পালাই-পালাই করে জানতাম। এই ভদ্রলোক গান শুনতে চান—এঁর সঙ্গীতানুরাগ তো কম নয় দাদা।'

কাঁচুমাচু মুখে দেবব্রত বললে, 'তোর কেবল কড়াকড়া কথা জানা আছে। ভদ্রতা জানিস না। কাকা কত বড়লোক তা তো জানিস? বাড়ি বয়ে এসে গান শুনতে চাইছেন—'

কাঠের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে নীলা ফিক করে হেসে ফেললে, 'বড়লোক তাতে আমার কী দাদা। তোমার এই খুড়শ্বশুর আমাকে বিয়ে করে পাটরাণী বানাবেন?'

এতক্ষণে দেবব্রত যেন বুঝতে পারল, নীলা সবটাই ঠাট্টা করছে। বললে, 'কী-যে বলিস।'

যেমন ছিল তেমনি ভাবেই নীলা দাদার ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল, দেবব্রত বললে, 'শাড়িটা বদলে আসবি না?'

হাত ঘুরিয়ে মোয়া দেবার মুদ্রায় নীলা বললে, 'শাড়ি টাড়ি নেই দাদা। ময়লা শাড়িপরা মেয়ের গান যদি ভাল না লাগে তবে আর ও-সব হাঙ্গামায় কাজ নেই ; ভদ্রলোককে শুধু চা খাইয়েই খুশি করে দাও।' একটু অপেক্ষা করে আবার বললে, 'তার চেয়ে আমি বলি কি দাদা, এই শাড়ি পরেই ভদ্রলোককে গান শোনানো যাক। খুশি করতে পারলে বরং একখানা শাড়ি বখ্শিষ চেয়ে নেওয়া যাবে, কী বলো।'

পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল, অবিনাশবাবু হাত ধরে তুললেন। 'থাক, থাক, বোসো।'

ভ্যাপসা গরমে মাদুরে বসে বসে ঘেমে উঠছেন অবিনাশবাবু। মুখের পাউডার গলে গলে কামানো গালের রোমকূপে রোমকূপে জমেছে। প্রায়-পাকা দাড়ির সমস্যা অবিনাশবাবু দু'বেলা কামিয়ে মিটিয়েছেন। মাথার চুলে অবশ্য কলপ লাগাতে হয়েছে। আহা, কলপ গরমে গলে না? নীলা মাথা নিচু করে ঠোঁট টিপে হাসি গোপন করে ভাবলো, তা হলে কী দৃশ্যই হ'তো!

বৌদির এই কাকা বিপত্নীক, নীলা জানে। টাকার গরমে পত্নীশোক ভোলা যায়, কিন্তু বয়স ঠেকানো যায় না। অসফল প্রয়াসে মুখের রেখাগুলো বরং আরো কুঞ্চিত হয়ে আসে।

কী গান গাইবে স্থির করতে করতেই কিছুক্ষণ কেটে গেল। একখানা রামপ্রসাদী ধরবে ভেবেছিল নীলা, শেষ পর্যন্ত একখানা ভজন ধরলো।

'আহা-হা।' গান শেষ হতে অবিনাশবাবু বললে, 'কী গান। প্রেমের এমন মাধুর্য—'

'প্রেম নয় তো', হারমোনিয়মটা সরিয়ে নীলা বললে, 'ভক্তি।'

'আহা-হা। প্রেম মানেই তো ভগবৎ প্রেম। ভগবৎ প্রেম মানেই তো ভক্তি।' গদ্‌গদ গলায় অবিনাশবাবু বললেন, 'কোথায় গান শিখেছ—?' এদিক ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'এ-বাড়ীতে তো—'

'রেডিও নেই।' মনের কথাটি যেন ধরে নিয়ে নীলা বলে উঠল, 'গ্রামোফোনও না। এদিকে ওদিকে যা পারি একটু আধটু শিখেছি।'

নীলা ক'টা মেডেল পেয়েছে দেবব্রত সেই ফিরিস্তি শুরু করেছিল, অবিনাশবাবু সে সব শুনলেন কিনা সন্দেহ। হঠাৎ বললেন, 'আমি একটা রেডিও পাঠিয়ে দেব। আমার তো দুটো!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে, হাই তুলে বললেন,—'কে-ই বা আছে। কে শোনে।'

'এ-বাড়িতে তো ইলেকট্রিক নেই।' নীলা বলে উঠল, 'রেডিও এসে বোবা হয়ে থাকবে।'

'নেই?' আবিষ্কৃতিটা নতুন নয়, তবু যেন অবিনাশবাবু বিস্ময় বোধ করেন।—'বেশ তবে ব্যাটারি সেট—ব্যাটারি সেটে হবে না?'

'ভারি চমৎকার লোক আমার এই কাকা।' অবিনাশবাবু চলে যেতে অমিতা উচ্ছ্বসিত হয়ে বললে! 'ছোটবেলা থেকেই আমাকে এত ভালোবাসেন। এ-

বাড়িতে এসে সব দেখে শুনে বলেছেন ওঁকে—তোমার দাদাকে নিজের 'বিজনেসে নিয়ে নেবেন।'

নীলা ভাবলে, তাই বলো। দাদা নিজের ফিকিরে আছেন। নীলাও তার কর্তব্য করেছে, গান গেয়ে তুষ্ট করেছে দেবাদিদেবকে। দাদার হয়তো ঠাঁই হবে বিজনেসের পালতোলা নৌকায়। কিন্তু নীলা বুঝতে পারলে না তার ভূমিকা কী।

ঘরখানার চেহারা ফিরিয়েছে শান্তি। দরজায় জানালায় পুরোনো শাড়ির রঙীন পর্দা। ইঁট দিয়ে উঁচু করে পাতা তক্তপোষের ওপর বিছানা, নিচে একটা তোরঙ। এক কোণে ছোট কাঠের একটা টেবিল, বেতের চেয়ার একটা। জানালার পাশে ছোট একটা জলচৌকি।

অভাব শুধু আলোর। দিনের আলো নেই-ই, রাত্তিরেও পারতপক্ষে শান্তি আলো জ্বালবে না। জিজ্ঞাসা করলে শুধু হাসে। রাত্রিবেলা অন্ধকার থাকবে, এই না বিধাতার ইচ্ছে ছিল? তবে আমরা খামোখা আলো জেলে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে যাই কেন।

ওকি আবার একটা যুক্তি হল! শান্তি আবার নিজেই বলে, 'আসল কথাটা কী জানো ভাই, আমার চোখ খারাপ। হারিকেনের চড়া আলো সয় না। তাই ঘরটাকে ঠাণ্ডা রাখি! কেন, ওই তো টেবিলের ওপর মোমবাতি জ্বলছে, সারা ঘরটাই তো দেখা যাচ্ছে, যাচ্ছে না?'

কিন্তু রান্না?

রান্না তো শান্তি করে না; দিনেও না, রাত্রেও না! হোটেল থেকে খাবার আসে। খরচ বেশি, ঝামেলা কত কম। কবে যেন ভাতের ফ্যান গালতে পা পুড়ে গিয়েছিল শান্তির, সেই থেকে মণীন্দ্র এই ব্যবস্থা করেছে।

ঘেন্না করে না?

'ঘেন্না! হোটেলের রান্নাকে আবার ঘেন্না কিসের। অত যদি খুঁৎখুঁতে হব ভাই, তবে তো এ-বাড়িতে থাকতেও ঘেন্না করত। এভাবে বেঁচে থাকতেও।'

হোটেলের রান্নাই বরং ভালো। আজ ভাত আর চিংড়ির তরকারি, কাল পুরী আর ডালনা, পয়সা থাকলে কোনদিন বা মুরগীর মাংস আর পাঁউরুটি! অরুচি হবার যো নেই।

সব বুঝতে পেরেছে নীলা, শুধু বোঝেনি মণীন্দ্র সান্যালের বৃত্তিটা কী! কোন দিন সে সারাদিনের মতো উধাও, কোন দিন সারাদিনরাতই ঘরে বন্দী।

শান্তিকে জিজ্ঞাসা করলেও সোজা জবাব পাওয়া যায় না। শুধু হাসে। 'কী জানি ভাই, পুরুষমানুষের বাইরের খবর কী? আমি গৃহস্থালী নিয়ে আছি।'

নীলাদের দেখাদেখি—দেখাদেখি কি না কে জানে, নীলাদের মনে হয়েছে দেখাদেখি—শান্তিও নিজের ঘরখানা আলাদা দুভাগ করে নিয়েছে পর্দা ঝুলিয়ে। ভেতরটার নাম অন্তঃপুর।

সে-দিন পর্দার ওপাশ থেকে গুণগুণ কথার আভাস পেতেই নীলা উঠে পড়ল। বললে, 'আমি চলি ভাই শান্তিদি।'

'এই তো এলে, এক্ষুণি ?'

'আপনার বাসায় বাইরের লোক এসেছে মনে হচ্ছে।'

'বাইরের লোক ? কই না-তো। ও-পাশে তো উনি একা।'

'গুন্‌গুন্‌ আলাপ শুনছি যেন।'

শান্তি এবার হেসে ফেলল। 'ও-পাশে উনি অরুন্ধতীকে নিয়ে আছেন, জানো না ?'

'অরুন্ধতী কে ?-

শান্তি আরো গলা নামিয়ে বলল, 'ওঁর মনের মেয়েমানুষ। আজকাল তো ওকে নিয়েই আছেন।' তারপর হেঁয়ালি ঘুচিয়ে নিজেই বললে, ওকে ওঁর নূতন গল্পের নায়িকা! একটু একটু করে লেখেন, আর নিজেই পড়ে পড়ে শোনেন কেমন হয়েছে। তখন আমারো ও-দিকে যাবার হুকুম নেই।'

নীলা এই প্রথম বুঝল মণীন্দ্রবাবু সাহিত্যিক। শান্তি বললে, 'তুমি জানতে না বুঝি। ওমা উনি আধুনিক সাহিত্যিকদের মধ্যে একজন অগ্রণী, আর তুমি নামও জানতে না ?'

শান্তি সেইদিনই নীলাকে মণীন্দ্রের লেখা খান দুই বই দিয়ে দিলে।

সেদিন কলেজ ছিল না, সারা দুপুর নীলা কখনো বুকের নিচে বালিশ রেখে, কখনো মাথার নিচে বালিশ দিয়ে বই দু'খানা পড়ে শেষ করে ফেললে। পড়তে পড়তে কখনো নিজেরই কর্ণমূল আরক্ত হয়েছে, আধুনিক ভাষার খোয়ায় চোখ হোঁচট খেয়েছে, কিন্তু কৌতূহল বেড়েছে বই কমেনি। ওই ভালো-মানুষ লোকটির পেটে পেটে এত কথা, এমন কিম্ভূত সব প্লটও মনে আসে ?

পড়া সারা হতে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো বিকেলে। দু'একটা জায়গা তার অস্বাভাবিক মনে হয়েছে, দু'একটা চরিত্র মনে হয়েছে খাপছাড়া। ভেবেছিল শান্তির সঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করা যাবে।

গিয়ে দেখলে শান্তি চুপ করে বসে আছে জানালার ধারে। পর্দার ওপাশে তেমনি গুন্‌গুন্‌ শব্দ।

'এখনো লেখা শেষ হয়নি ?' নীলা জিজ্ঞাসা করল ফিস্‌ ফিস্‌ করে, 'তবে আমি যাই।'

'যাবে কী। বসো।' শান্তি বললে শুকনো হেসে।

'খেয়ে উঠেই আবার লিখতে বসেছেন বুঝি ?'

'খাওয়া তো হয়নি।'

'সে কী।'

চট্‌ করে নীলার হাত থেকে বই দু'খানা নিয়ে শান্তি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বইগুলো গুছিয়ে রাখতে লাগল। 'গল্পটা সারা হবে, কোন সম্পাদককে দিয়ে টাকা হাতে আসবে, তবে তো খাবার কেনা হবে ভাই।'

ঠিক সেই সময় মণীন্দ্র পর্দা সরিয়ে শান্তিকে কী বলবে বলে এদিকে এসেছিল। নীলাকে দেখে একমুহূর্ত ইতস্তত করে ওর লেখার কোনটিতে ঢুকল গিয়ে ফের।

অস্বচ্ছ আলোয় নীলা দেখতে পেল অস্নাত, অভুক্ত চেহারা ; না-কামানো গাল ; ঈষৎ লোহিত চোখ।

এমন খাপছাড়াও মানুষ হয়।

গল্পটা সেদিন লেখা শেষ হয়েছিলো সন্দেহ নেই। টাকাও এসেছিল। নইলে রাত ন'টায় সময় শান্তি এসে জিজ্ঞেসা করত না নীলাদের উনুনে আঁচ আছে কি না।

'কী ব্যাপার ?' নীলা জিজ্ঞাসা করলে।

'ওঁর ক'জন বন্ধু এসেছে। তাদের চা খাওয়াতে হবে। উনুনই শুধু নেই। ওরা আজ সারারাত নাকি তাস খেলবে।'

'কে—কে ? না, কবি ইন্দ্রজিৎ, পাব্লিশর সদানন্দ আর—'

'আপনার ঘুম হবে?' নীলা জিজ্ঞাসা করল, 'পর্দার ও-পাশেই অতোগুলো লোক—অস্বস্তি হবে না ?'

'অস্বস্তি আর কী !' শান্তি অল্প হাসল, 'আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।'

কিন্তু পরদিন সকালেও পর্দার ও-পাশে গুন্ গুন্ কথা শুনে নীলা অবাক হ'ল।

'আজও লিখছেন নাকি ? গল্পটা কাল শেষ হয়নি ?'

'গল্প তো গল্প, গল্পের টাকা শুদ্ধ কালকে শেষ হয়ে গেছে। কাল সব হেরেছেন কিনা। আজ সকালে উঠেই আবার তাই লিখতে বসেছেন—টাকা আনতে হবে তো।'

'বলেন কী। আজ তবে আপনাদের খাওয়া দাওয়া হবে না বলুন ? চলুন শান্তিদি, আপনি আমাদের ওখানে দু'টি খেয়ে নেবেন।'

মিটি মিটি হাসল শান্তি।

'তার দরকার হবে না ভাই, সে ব্যবস্থা করেছি !'

কী ব্যবস্থা তাও বুঝিয়ে দিলে শান্তি।

'উনি হারেন বটে, কিন্তু বন্ধুরা তো জেতে। আর সকালে যাবার সময় ওরা জেতার সব টাকা চুপি চুপি আমাকে দিয়ে যাবে বলেই না ওদের আমার ঘরে বসে জুয়া খেলতে দি।'

'আপনি আশ্চর্য হিসেবি তো শান্তি দি ?'

'হিসেবি হবো না ভাই ? নইলে তুমি কি মনে করো এই অনিশ্চিত গল্প লেখার টাকার ভরসায় সংসার চলে, না, চালানো যায় ?'

৪

যত দূরই হোক, পপ্লার পার্ক থেকে কিনু গোয়ালার গলি, শহরটা তো

এক। যেন একই বাড়ির পাঁচতলা আর একতলা। একজন ভাসছে হাওয়ায়, হাসছে রোদ্দুরে, আর একজন ঘামছে গরমে, কাঁপছে অন্ধকারে, বুঝি এতবড় বাড়িটাকে ঘাড়ে রাখার ভারেও।

তাই সৌম্য যখন এসে সম্মুখে দাঁড়াল, নীলাকেও প্রতি-নমস্কার করতে হল।

'চিনতে পেরেছে নীলা -

'পেরেছি। ভয় ছিল আপনি পারবেন না ?

'তারপর ? এখানে ?'

'আমরা তো এদিকেই থাকি সৌম্যদা।'

'ওহো, শুনেছিলাম বটে তোমরা আজকাল এদিকে আছো। কী একটা রাস্তা যেন—নামটা ঠিক মনে পড়ছে না,—কী যেন একটা quaint name।'

'কিনু গোয়ালার গলি।' নীলা পরিষ্কার গলায় উচ্চারণ করলে।

'ইয়েস।' সিগারেট ধরিয়ে সৌম্য বলল, 'মনে পড়েছে। যাব একদিন তোমাদের ওখানে। মাসিমা কেমন আছেন ? মেশোমশাই ? তোমার দাদা ? কোথা দিয়ে কোথায় যেতে হবে বলে দাও তো একটু। নম্বর কত ?'

'ছয়ের এফ।'

'ছয়ের এফ, কিনু গোয়ালার গলি ?' পকেট থেকে ছেঁড়া এক টুকরো কাগজ বের করে সৌম্য ঠিকানাটা লিখে রাখলে—'এবারে ডিরেকসন দাও তো।'

নীলা সাধ্যমত বর্ণনা দিলে।

'দাঁড়াও দাঁড়াও, জাস্ট এ মিনিট। ছ' নম্বর রুটের বাস টার্মিনাসের পরে মহেশ আড্ডি স্ট্রীট ? তারপর কী যেন বললে নামটা—গঙ্গাপদ, গন্ধা, গন্ধা কী যেন ?' কুন্ঠিত হেসে সৌম্য বললে, 'আমার আবার এদিকে এলে কেমন সব গুলিয়ে যায়,—a queer area ! কী নোংরা আর কী সরু আঁকা বাঁকা পথ,—পকেটে কম্পাস না থাকলে দিক্ ভুল হয়ে যেতে পারে। হ্যাঁ, তারপর ? গন্ধাপদ শ্রীমানী স্ট্রীট থেকে কোন দিকে যেতে হবে ?'

স্থির চোখে ওর দিকে তাকিয়ে থেকে নীলা শীতল গলায় বললে, 'আপনি চিনে যেতে পারবেন না সৌম্যদা, আমি বুঝতে পেরেছি।'

'কী যে বলো। এটুকু পারব না। আচ্ছা, ঠিকানা তো টুকে রাখলুম, এবার দেখবে একদিন গিয়ে হাজির হয়েছি।'

'দেখাই যাক।' নিচু নিষ্প্রভ গলায় নীলা বললে।

'তারপর ? তুমি কলেজেই পড়ছ তো ? ভালো, ভালো, খুব ভালো। আচ্ছা এবারে চলি নীলা।'

সৌম্য চলে যাবার পর নীলা অন্যমনস্ক ভাবে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিল। পায়ের কাছে কী একটা কাগজ হাওয়ায় খসখস করছে নিচু হয়ে তুলে নিলে।

সেই চিরকুটটা। যেটাতে সৌম্য একটু আগেই নীলাদের হাল সাকিন টুকে নিয়েছিল।

আলগা কাগজ, উড়ে পড়েছে। পড়তই। আজ না হয় কাল। নীলা আপন মনেই একটু হাসল।

অনেকক্ষণ ধরে কাগজটাকে মুঠোর মধ্যে চেপে একটা ঢিল পাকালে। তারপর, অনেকটা যেন সামনের ল্যাম্প পোস্টটাকে তাক করে, ছুঁড়ে ফেলে দিলে রাস্তায়।

মনের ভুলে অসাবধান সৌম্য ঠিকানাটা ফেলেই রেখে গেছে, তা যাক। কাগজটা সঙ্গে থাকলেই কি সৌম্য কোন দিন ফিরে আসত। কিম্বা কিনু গোয়ালার গলির স্যাঁতসেতে ঘরে নতুন করে আবিষ্কার করত নীলাকে?

ঘিঞ্জি, নোংরা পাড়া। সৌম্য অবশ্য মিষ্টি করে বলেছিল quaint। কে জানে, এই কিম্ভূত পটভূমিতে নীলাকেও সৌম্যর কিম্ভূত লেগেছে কিনা।

সৌম্যরা যে আর কোন দিন আসবে না, নীলার জানা। না সৌম্য, না মনন, না মণীশ। ওদের পরিচ্ছেদ পপ্‌লার পার্কে'ই শেষ হয়ে গেছে।

লাজুক চেহারার যে ছেলেটি পপ্‌লার পার্কে ওদের প্রতিবেশী হয়ে এসেছিল কয়েক বছর আগে, সেও তো সৌম্য। এই সৌম্য-ই। মফঃস্বলে জজিয়তি করতেন ওর বাবা। রিটায়ার করার পর কলকাতায় এসে বাড়ি করলেন।

একেবারে পাশের বাড়ি, ওপাড়ায় লোক কম। আয়া-খানসামা-বাবুর্চি-দরোয়ান বাদ দিলে বাড়ি পিছু তিনচার জন। আবার বাড়ি মানে অন্তত, বিঘে দুই। আলাপ হল। তখন কী বিনয়ী আর তৃণসুনীচ ছিল এই সৌম্য। জানত, জজ হোক, ব্যারিস্টার হোক, এ-পাড়ায় ওরা আপস্টার্ট'ই। এ সমাজে চলতে হ'লে নীলাদের ছাড়পত্র লাগবেই।

কোনদিন সাহস করেনি, বাড়াবাড়ি করেনি, তবু সৌম্যদের উদ্বাহু আশার কথা কিছু কিছু আঁচ করেছিলেন মা। বিশেষ আপত্তি ছিল না; একটুখানি খুঁতখুঁত ছিল, সৌম্য লেখাপড়া শেখেনি। তাতেও হয়ত কিছু এসে যেত না, দু' হাত এক হয়ে যেত, যদিনা—

সেই সময় মনন এসে পড়ত। মার বাপের বাড়ির সম্পর্কে কী রকম আত্মীয়; কিন্তু সেইটেই বড় কথা নয়, আসল কথা মনন মার্কিন-ফেরৎ। এক মোটরে মনন পরপর দু'মাস আসেনি নীলাদের বাড়ি। প্রথম প্রথম নীলাদের অবাক লাগত। শেষে জানতে পেরেছিল, মনন ডেনভারের একটা অটোমোবিল কোম্পানীর এজেন্ট। সেটা প্রাক্‌যুদ্ধ যুগ, মেয়েদের শাড়ির ফ্যাশানের চেয়ে তাড়াতাড়ি পুরুষের মোটরের মডেল বদলাচ্ছে—আজ রাতে যা আধুনিকতম, কাল সকালে তা বাসি।

নতুন নতুন মডেল আছে, ট্রায়েল দিতে বেরয় মনন। নীলাদের ডাক লাগে।

একবার মননের সঙ্গে আসানসোল পর্যন্ত গিয়েছিল ওরা। মনন নীলা, আর মা।

ফেরবার পথে মা যখন গাড়িখানার অনায়াস দ্রুতগতির প্রশংসা করে

বললেন, 'এইটেই তো লেটেস্ট,—না মনন?' মনন ঘাড় না ফিরিয়াই অল্প হেসে জবাব দিলে, 'ক জানি, মাসিমা। কলকাতা ফিরে যেতে যেতে হয়ত দেখব এও পুরানো হয়ে গেছে। লোকে একটা পাল্কির মতো বিগত যুগের রেলিক হিসেবে দেখছে।'

'বলো কী মনন, এই ক' ঘণ্টায়?'

এতদিন কোন ক্রমে আশায় বুক বেঁধেছিল সৌম্য। যেদিন শুনল নীলারা আসানসোল গিয়েছিল, সেদিন থেকে যাওয়া-আসা একেবারেই কমিয়ে দিলে। কমিয়ে কি ভাল করেছিল? প্রতিযোগিতা ভীরুর নয়! এর চেয়ে সৌম্য পাল্লা দিয়ে একটা স্টিমার ভাড়া করল না কেন, এসে কেন বলল না 'চলো রায়গঞ্জ',—নীলা কি তখন আর না বলতে পারত।

তারপর মননই একদিন কথাটা পাড়ল।

'আসা-যাওয়া আমিও কমিয়ে দেব ভাবছি।'

'কেন?'

'রোজ রোজ আসবার কি মানে হয়?'

'তাতে কী, আপনি তো আত্মীয়। মার মামার—'

হেসে উঠেছিল মনন। 'থাক হিসেব কোরো না, কূল পাবে না। বড় দূরের সম্পর্ক। আচ্ছা নীলা,' গলাটাকে অকস্মাৎ খুব নিচু, গাঢ় করে মনন বলেছিল 'এটাকে খুব কাছের করেও তো নেওয়া যায়।'

হয়ত সম্পর্কটা খুব কাছেরই হয়ে যেত এতদিনে, যদিনা নীলার ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য কিছু দিন অপেক্ষা করতে হত। তারপরে এলো দুর্দৈব। শেয়ার বাজার নামছিল অনেক দিন ধরেই, বাবার পাকা চুলের সংখ্যা একটা দুটো করে বাড়ছিল রোজই। তারপর ব্যাংক ফেল পড়ল।

এক রাত্রে বাবার সব চুল সাদা হয়ে গেল।

পপ্‌লার পার্কের প্রাসাদ যে বাঁধা পড়েছে সেটা জানা গেল আরো ক' মাস পরে। ফার্ণিচার নিলাম হল। ভবানীপুরের ভাড়াটে বাসায় উঠে আসতে হল।

পপ্‌লার পার্ক থেকে চলে আসার দিন ওরা ভবানীপুরের বাসার ঠিকানাটা চেয়ে রেখেছিল,—মনন, সৌম্য, মণীশ। কথা দিয়েছিল মাঝে মাঝে যাবে।

অন্তত মননকে তো মা আসবার সময়ে চোখে জল এনে বলেছিলেন, 'তুমি কিন্তু যেয়ো বাবা। বিপদের উপর বিপদ। নইলে দু'হাত কবেই তো এক হয়ে যেত। যাক, সে যতই অসুবিধে হোক, যেভাবে পারি, এ অঘ্রাণেই আমি বিয়ের বন্দোবস্ত করব। তুমি যেয়ো।'

মনন ভিজে, নিচু গলায় বলেছিল, 'যাব বৈকি, মাসিমা।'

বলা বাহুল্য, মনন আসেনি।

মা একবার খবর পাঠানোর কথা তুলেছিলেন, ভবানীপুরের আসবার পর। বাবা কঠিন ভাবে বাধা দিয়েছিলেন। বাবা না দিলে নীলা নিজেই

দিত।

তারপর অঘ্রাণ মাসে, শোনা গেল, মনন আবার বিলেত পাড়ি দিয়েছে। মোটর নয়, এবারে এভিএশন এক্সপার্ট হয়ে আসবে। এর আগেই একটা ফ্লাইং ক্লাবের মেম্বর হয়েছিল মনন। নিজে একটা 'মথ'ও কিনেছিল। প্রায়ই দিল্লি-বম্বে পাড়ি জমাতো, পুরী যেতো সমুদ্র স্নানে।

শুধু কি মনন। পপ্‌লার পার্কের সৌরমণ্ডলের কেউ কি এসেছে ভবানীপুরের বাসায়?—রেবা-মাসি, অচলা-পিসি, মল্লিকা ললিতা? কেউ না। এত আলাপ যাদের সঙ্গে, এত ঘনিষ্ঠতা আত্মীয়রা, সবাই মনে রইল শুধু নামে, অতীতের খাতায়, এককালের চেনামাত্র হয়ে। এত পার্টি, এত পিকনিক, এত এক্সকার্শন—পপ্‌লার পার্ক থেকে একটি আমন্ত্রণের হাতও অগ্রসর হয়ে এল না।

তবু ভালো, ওরি মধ্যে নীলা কলেজে ভর্তি হতে পেরেছিল, অনেক কিছু ভুলতে পেরেছিল পড়াশুনায় মন দিয়ে।

বাবা তখনো সামাল দেবার স্বপ্ন দেখছেন। কিন্তু সা'পুরের গুদামেও যখন আগুন লাগল, তখন প্রায় ভেঙে পড়লেন। পাকা চুলও ঝরতে লাগল একটি দুটি করে। টাক দেখা দিল। গুদাম ইন্‌সিওর করা ছিল, কিছু টাকা পাওয়া গেল। ওরা চলে এল বৌবাজারে।

ভবানীপুরের বাড়িটাও ছোট ছিল; লন নেই, রক ছিল। ছোট, তবু তো গোটা। বৌবাজারে চারখানা ঘর পঞ্চাশ টাকা। গলির মধ্যে, পরিসর কম। তবু ওরই নামই ফ্ল্যাট।

তারও পর কিনু গোয়ালার গলি। বাবা বললেন, 'ছেলে মেয়ের পড়ার খরচ জুগিয়ে ভাড়া টানতে পারব না। জমানো টাকা এই কটা তো মোটে সম্বল। ফুরোতে কতক্ষণ!'

এরও উপর ডাক্তারের খরচ ছিল। বৌবাজারের বাসায় এসেই মা অসুখে পড়েছিলেন। অল্প অল্প কাশি, শ্বাসকষ্ট, বুকের পাঁজর বেরিয়ে পড়ছে।

কিছুদিন যেতে বোঝা গেল হাঁপানি। মা বিছানা নিলেন।

৫

শান্তির ঘরের সেই ইন্দ্রজিৎ কবিকে নীলা দেখেছে কয়েকবার।

অবশ্য কবিদের সম্পর্কে বিশেষ কোন কৌতূহল ওর যে কখনো ছিল, তাও না। কবিতা সম্পর্কেও না। পাঠ্য-পুস্তকে, পত্রিকার পাতার নিচের দিকে মেলানো কিছু ছড়া থাকে বটে; আর পুরস্কার-বিতরণী সভায় সেসব আবৃত্তি করে বাহাদুরিও পাওয়া যায়।

কিন্তু চর্মচক্ষে একজন কবি নীলা এই প্রথম দেখল। এমন পরিপাটি করে ছড়া মেলায় যারা, তারা সামান্য নিজের পোষাকটাও মেলাতে পারে না কেন, অবাক লাগে। ভাঁজ-ভাঙা পাঞ্জাবির সঙ্গে ময়লা ধুতি, মরি মরি রুচি।

শান্তির ঘরে কিছু কিছু বাঙলা পত্রিকা ছিল। তারাই পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ইন্দ্রজিতের দুচারটে কবিতা নীলার চোখে পড়েছে।

'শান্তিদি, এই ইন্দ্রজিৎ রায়ই তো আসেন আপনাদের বাসায়, না?'

'নইলে, অমন ছন্নছাড়া আর ক'জন হবে। তুমি বুঝি ওই ছাইভস্ম পড়ছ ভাই?'

ছাইভস্ম কিনা কে জানে, নীলা বুঝল না একবর্ণ। এদের চেহারা পোষাক যে কেন মিলছাড়া তার কারণ বোঝা যাচ্ছে একটু একটু।

যেমন কবিতা, তেমনি তো কবি হবে। কবিতাতেই যেন মিলন আছে কত।

কিন্তু ছেলেটা ইঁচড়ে পাকা সন্দেহ নাই। যে-সব কথা লিখেছে, সবটা মিলে কোন মানে হয় না যদিও, আলাদা আলাদা কথাগুলো তো নীলা জানে। কোন ভদ্রলোকের কলম থেকে এসব কথা কি বেরুতে পারে? আবার বলা হয় শিক্ষিত। বি. এ. পাশ করে এম-এ, ল পড়া হচ্ছে। পড়া হচ্ছে না ঘোড়ার ডিম। কলকাতার মেসে বসে বাপের টাকা ওড়ানো হচ্ছে।

শান্তি হাসে। 'বলো, ভাই বলো। আমি তো বলে বলে হয়রান হয়ে গেলুম। আমাদের কি আমল দেয়; তুমি কলেজে পড়ছ, তোমাকে যদি সমীহ করে একটু।'

আড়ালে যাকে নিয়ে এত, সে হঠাৎ এসে পড়লে কিন্তু কবিতা নিয়ে হাসাহাসি বন্ধ হয়ে যায় দু'জনেরই। প্রথম প্রথম নীলা পালাতে চাইত, আজকাল শান্তির পীড়াপীড়িতে বসতে হয়।

কিন্তু মাথামুণ্ডু লেখার জন্যে ইন্দ্রজিৎকে ধমকাবে কি, নীলা নিজেই আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। মাথা নিচু করে পত্রিকার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে আড়চোখে চেয়ে দেখে; ওই এক রত্তি মানুষ এখনো মুখে বয়সের পরিণতির আভাসমাত্রও আসেনি,—আরও দাড়ি ফলাবার পৌনঃপুনিক অসফল প্রয়াসে চিবুক আর গণ্ডস্থান ক্ষতবিক্ষত। আবার চেয়েও আছে হাঁ করে। কিন্তু এমন অপাপশিশু চোখে, রাগ করা চলে না।

আর, তখন থেকে নীলাও যে পাতা ওল্টায়নি, ইন্দ্রজিতের কবিতা আছে যে পৃষ্ঠায়, সেটাই খুলে রেখেছে চোখের সমুখে, সে খেয়াল কি নীলারই আছে।

'পড়লেন ওটা?'

প্রশ্নটা লাজুক গলার, চাউনিটা ভীরু।

তাড়াতাড়ি মুড়ে রেখে দিয়ে নীলা বললে, 'হ্যাঁ।'

'কেমন লাগল?'

প্রত্যাশাকাঁপা চোখের দিকে তাকিয়ে এতদিন ধরে রিহার্সেল দেওয়া কড়াকড়া মন্তব্যগুলো তলিয়ে গেল।

'ভালোই তো।' কুণ্ঠিত সুরে নীলা বললে, 'তবে একটু শক্ত। ভালো বুঝিনি।'

সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ পেয়ে ইন্দ্রজিৎ যে কবিতা বোঝবার নয়, প্রধানতঃ অনুভবের ; মস্তিষ্কের নয়, হৃদয়ের ;—এতসব শক্ত শক্ত কথা বোঝাতে বসবে, তা যদি জানা থাকত, তবে নীলা কোন মন্তব্যই করত না।

আর, সেই মুহূর্তে শান্তি ওঘর থেকে না এসে পড়লে ইন্দ্রজিতের কথার তুবড়ি বোধ হয় ফুরতো না।

'বক্তৃতা হচ্ছে ?' টানাটানা চোখে বিচিত্র হেসে শান্তি জিজ্ঞাসা করল। সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রশান্ত হয়ে গেল ইন্দ্রজিৎ।

'কিছু না, এই, ইয়ে একটু', বললে কোনক্রমে। ফণা মাটিতে নেতিয়ে পড়েছে।

শান্তিকে ইন্দ্রজিৎ যে ভয় করে এটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না। কিন্তু সে-ভয়টুকুও বিচিত্র। অন্ধকারে কালো বেড়াল দেখে চমকে ওঠা ঘর্মক্লেদাক্ত ভয় নয়, গভীর রাত্রে নদীর পাড়ে একলা বসে থাকার ভয়। ছমছমে, গায়ে কাঁটা দেয়, আবার ভালোও লাগে। অর্থাৎ শুধু ভয় নয়, বিস্ময়ও।

নইলে কায়ক্লেশে মেসে থাকার পয়সা বাঁচিয়ে কেউ রাত জেগে জুয়া খেলতে আসে ?—একথা নিশ্চিত জেনেও যে জিতলে সে পয়সা ঘরে যাবে না, একজনের হাতে তুলে দিয়ে ভোর রাতে সরে পড়তে হবে নিঃশব্দে ?

কোন কোন দিন এরই মধ্যে কোথায় কোথায় ঘুরে ঘরে এসে ঢোকে মণীন্দ্র। খাবারের ঠোঙা শান্তির হাতে তুলে দিয়ে মেজের ওপরই ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়ে।—'বোসো নীলা। ইন্দ্রজিৎ কতক্ষণ এসেছ ?'

'এই খানিকক্ষণ। আপনার ওটা ঠিক হ'ল ?'

হাই তোলে মণীন্দ্র। চোখ বুঁজে বুঁজেই জবাব দেয়, 'নাঃ! মোটে দশ পারসেণ্ট রয়ালটি দিতে চায়। এড্‌ভান্স কিছু দেবে না। বলে বাজার মন্দা।'

নতুন লেখা উপন্যাস নিয়ে মণীন্দ্র কিছুদিন ধরে পাব্লিশরদের কাছে ঘোরাঘুরি করছে, নীলা জানে।

'রাজি হননি তো ?'

'না। শেষ পর্যন্ত বরং আমাদের সদানন্দকে দেব ? ওর বিজ্ঞাপনের খরচ চালানোর মতো টাকা নেই, বই চালাতে পারবে না, জানি, কিন্তু আমাকে ও ফাঁকি দেবে না। ভারতী প্রকাশনী সতেরো পারসেণ্ট অবধি উঠেছিল। কিন্তু ওরা বই ফেলে রাখবে বলে ওদের দিতে ভরসা হয় না। নিজেদের প্রেস নেই, অথচ অনেকগুলো বইয়ের কণ্ট্রাক্ট করে বসে আছে। তার মধ্যে জলধর পাত্রের গোয়েন্দা নভেলই দু'টো—'গুণ্ডা ঋষি' সিরিজের বই। বিরাজ দত্তের নাটকও আছে একটা—সেই—সেই যে যেটা রঙ্গপীঠে চলছে। আগে এ-সব বই তারপর তো আমার!' ফের চোখ বুঁজে মণীন্দ্র বললে, 'ভাবছি, আমিও গোয়েন্দা কাহিনী লিখতে শুরু করব। বাইরে খুনে, দুর্দান্ত, অথচ আসলে পরোপকারের ফল্গু এরকম একটা আজগুবি চরিত্র কল্পনা করতে পারব না ?'

'আর ক'দিন অপেক্ষা করুন', ইন্দ্রজিৎ হঠাৎ জোর গলায় বলে উঠল, 'তারপর—'

'তারপর তুমি আমার বই ছেপে বার করবে, কেমন ?' চোখ খুলে মণীন্দ্র অল্প একটু হাসল,—'বাড়ী থেকে কত টাকা আসে তোমার ? ত্রিশ, চল্লিশ ? মেসের পাওনা, কলেজের মাইনে, সিগারেটের খরচার পরেও বাঁচে কত যে পাব্লিশর হবে স্বপ্ন দেখছ ? বরং—'

প্লেটে করে খাবার এনেছিল শান্তি ! ইন্দ্রজিতের হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'বরং আপনি একটা বিয়ে করুন। পণের টাকায়—'

মণীন্দ্র উঠে বসল, 'আশা করি বিয়ে করবে, কিন্তু পণ নেবে না, এরকম কোন কাঁচা আইডিয়ালিজম তোমার নেই ইন্দ্রজিৎ।'

কিছুক্ষণ শান্তির মুখের দিকে বোকার মত তাকিয়ে থাকল ইন্দ্রজিৎ। তারপর সিঙারা ভেঙে মুখে পুরতে পুরতে নির্জীব গলায় বলল, 'বিয়েই করব ভাবছি।'

খাওয়া-দাওয়া সারা হতে ইন্দ্রজিৎ বললে, 'আসুন মণিদা, একটু তাস খেলা যাক।'

'দু'জনে ?' মণীন্দ্র বললে, 'জমবে না। তা' ছাড়া পয়সা নেই।'

'দেশলাইয়ের কাঠি তো আছে।' মুচকি হেসে বলল শান্তি।

'আসুন তবে এমনিই খেলা যাক ;—ব্রিজ। চারজন তো আছি।'

'আমি খেলতে জানি না।' নীলা বললে।

শান্তি বললে, 'আমার মাথা ধরেছে।'

'তবে চলুন বেড়িয়ে আসি। মাথা ধরা সেরে যাবে।'

'তাই চলুন।'

সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হয়ে নিল শান্তি। পর্দার ওপাশ থেকে শাড়ি বদলে মাথা আঁচড়ে এল। টকটকে লাল পাড়টা খোঁপার প্রান্তে রইল শুধু। '—দেশলাইয়ের কাঠি দিন একটা,' হাত বাড়িয়ে বলল ইন্দ্রজিৎকে।

একটি কথা না বলে ইন্দ্রজিৎ গোটা বাক্সটাই সমর্পণ করলে শান্তির হাতে। এক হাতে আয়না নিয়ে জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল শান্তি, সিঁদুরের কৌটা খুলে দেশলাইয়ের কাঠির সাদা দিকটা দিয়ে বড়ো করে একটা টিপ পরল কপালে। তারপর নিষ্পলক ইন্দ্রজিতের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চলুন।'

'মণিদা উঠুন।'

মণীন্দ্র হাই তুলে বললে, 'আমার লেখা কিছুটা বাকি আছে ভাই। তোমরা বরং ঘুরে এসো।'

নীলার দিকে তাকিয়ে শান্তি বলল, 'আমি এখুনি ফিরব। তুমি ওঁকে এক ফাঁকে বরং এক পেয়ালা চা করে পাঠিও ভাই।'

ঠিক আধঘণ্টা পরেই বৃষ্টি নামল। জানালা খুলে কবিত্ব করবে উপায় কি। ছাটে ঘর ভিজে যাবে। হারিকেন জ্বালিয়ে চা করতে বসল নীলা। কিন্তু এর মধ্যে নিচে নিয়ে যাওয়াও সোজা নয়। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করল, তারপর মাথায় খবরের কাগজ দিয়ে নিচে নেমে এল !

দরজা ভেজানো। মণীন্দ্র লিখছে। কলম রেখে মাথা তুলে বলল, 'এসো

নীলা। চা এনেছ?'

পেয়ালাটা মণীন্দ্রের সামনে রেখে নীলা বললে, 'হ্যাঁ। শান্তিদি ফেরেনি?'

'না।' বাইরের দিকে তাকিয়ে মণীন্দ্র বলল, 'যা বৃষ্টি। কোথাও আটকে পড়েছে।'

বৃষ্টি থামল। মেঘ কেটে একটুখানি জ্যোৎস্নারও আভাস পাওরা গেল বাইরে। তখনো ভিজে কনকনে হাওয়া বইছে।

ইণ্ডিয়ান ইকনমিক্সের বই সামনে খুলে রেখে ওপরের ঘরে অনেকক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে বসে রইল নীলা, যদি শান্তিদের ফিরে আসার আওয়াজ পাওয়া যায়। বসে থেকে কখন এক সময় হাই উঠল, চোখ জড়িয়ে গেল ঘুমে, হ্যারিকেনের তেল ফুরিয়ে ফিতেটা দপ দপ করে জ্বলে উঠল।

আলো নিবিয়েও জেগে থাকতে চেষ্টা করল কিছুক্ষণ, ভাবল নিচে পা টিপে টিপে গিয়ে দেখে আসে।

কিন্তু এতদিনের গরমের পর আজ প্রথম ঠাণ্ডা হাওয়া, সারা শরীরের ওপরে যেন ঘুমের স্তূপ নেমেছে। ছাদে জমা জল পাইপ বেয়ে নর্দমায়। অনেকক্ষণ ধরে সেই ঝর্ঝর শব্দ শুনল। তারপর একসময় সেই শব্দ মাথার অবসন্ন স্নায়ুর ঝিম্‌ঝিমের সঙ্গে একাকার হয়ে গেল। আর কিছু শোনা গেল না।

শান্তির সঙ্গে দেখা হ'ল পরদিন সকালে, কলতলায়। কাল যে শাড়িটা পরে বেড়াতে গিয়েছিল শান্তি, সেটাই সাবান দিয়ে কাচছে।

'কাল কখন ফিরেছিলেন শান্তিদি?'

'অনেক রাতে। রাম, রাম, কী বিষ্টি কী বিষ্টি।'

'কদ্দুর গিয়েছিলেন?'

'অনেক দূর। ট্রেনে করে ডায়মণ্ডহারবারের দিকে। যেই নেমেছি অমনি বৃষ্টি শুরু হ'ল। দেখছ না, কী কাদা লেগেছে শাড়িটায়। পাড়াগাঁ মতন, চারধার ওরই মধ্যে অন্ধকার হয়ে এসেছে পোড়ো চালাঘরের মধ্যে দু'ঘণ্টা—'

'ভয় করল না?'

'কাকে?' মুখ টিপে হেসে শান্তি বললে, 'ইন্দ্রজিৎকে?'

নীলা সাপটাপের কথা ভেবেই ভয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেছিল। কিন্তু শান্তি ততক্ষণে বলে চলেছে, 'কাকে ভয়? ইন্দ্রজিৎকে? ও তো একটা পুঁচকে ছোঁড়া।'

'তা হলেও এম-এ, ল, পড়ছে। তেইশ চব্বিশ বছর বয়স কি আর হয় নি?'

'তেইশ চব্বিশ? তুমি ভাই হাসালে। বয়স বাড়িয়ে বলা ও ছোঁড়ার স্বভাব। কোথাও আমল পায় না, না পুরুষের আসরে, না মেয়েমহলে।'

আরো জোর দিয়ে ফিরে সাবান ঘসতে লাগল শান্তি। শাড়িটাতে কালকে লাগা কাদার চিহ্নটুকুও যেন না থাকে। বললে, 'ওর আসল বয়স

কুড়ির একদিন বেশি না। যতই বাড়িয়ে বলুক না কেন। আমি বাজী রাখতে পারি নীলা।'

ভিজে কাপড় গায়ে জড়িয়ে ঘরে ঢুকতে যাচ্ছিল কাপড় ছাড়বে বলে—নিচে কলতলার অনেক বে-আব্রু অসুবিধে—পিছিয়ে আসতে হ'ল।

দরজার ঠিক সমুখে মাদুর পেতে বাবা প্রমথ পোদ্দারের সঙ্গে দাবা খেলছেন।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে গামছা জড়িয়ে জড়িয়ে নিঙড়ে ফেলতে হ'ল। তারপর চেঁচিয়ে বৌদিকে ডাকল, 'বৌদি, একটা শুকনো কাপড় দিয়ে যাও ভাই!'

বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুনল, প্রমথ বাবাকে বলছে, 'কাল নিচের ঘরের লক্ষ্মীঠাকরুণ অনেক রাত অবধি বেড়িয়ে ফিরলেন মশাই।'

'তাই নাকি।' শিবব্রত মাথা নিচু করে চাল হিসেব করছিলেন, কথাটা খেয়াল করলেন না।

প্রমথ আবার বললে, 'অনেক রাত্রি তখন, ঝড়জলে মোড়ের গ্যাস পোস্টটাও কাৎ হয়ে পড়েছে। হঠাৎ হাঁটুজল ভেঙে লোক চলার ছপছপ শব্দ শুনতে পেলুম। এত রাত্রে আবার কে। তাকিয়ে দেখি আমাদের এই নিচের তলার মা লক্ষ্মী—কী বলব মশাই ভিজে শাড়ি গায়ে লেপ্টে রয়েছে, হাতে স্যাণ্ডাল, পায়ের আধাআধি পর্যন্ত কাপড় তুলে—'

'চাল দিন পোদ্দার মশাই।' শিবব্রতবাবু মাথা নিচু করেই তাড়া দিলেন।

'চাল আবার দেব কী। সে আমি ভেবেই রেখেছি। এই ঘোড়ার চালেই তো আপনি মাৎ। লক্ষ্য করেন নি?'

দাবা বোড়ে থলেয় পুরতে পুরতে প্রমথ বললে, 'আসুন একদিন পাশা খেলা যাক। আরো জমজমাট্।'

'পাশা?' শিবব্রতবাবু হেসে বললেন, 'যা খেলে যুধিষ্ঠির ফতুর হয়ে গিয়েছিলেন?'

'তাতে কী হয়েছে, আপনি তো আর যুধিষ্ঠির নন। আর আপনার ভয়ই বা কী। যুধিষ্ঠির খেলে ফতুর হয়েছিলেন, কিন্তু আপনি তো ফতুর হবার পরই খেলছেন। তারপর যা বলছিলুম, সঙ্গে একটা কমবয়সী ছোঁড়া, দেখি নিচের ঘরের মা-লক্ষ্মী!'

'বড়ো লক্ষ্মী মেয়ে', শিবব্রতবাবু বললেন।

'লক্ষ্মী, লক্ষ্মী' আপন মনেই কথা দুটোর পুনরাবৃত্তি করল প্রমথ, আপনার মনেই হাসল।

'বাবা' নীলার কঠিন গলা শোনা গেল বাইরে থেকে, 'শুনে যাও তো।'

শিবব্রতবাবু বেরিয়ে আসতেই চাপা, অসহিষ্ণু গলায়, অথচ প্রমথর কানে না যায় এমনভাবে নীলা বলল, 'ওই ইতর লোকটাকে তুমি তবু প্রশ্রয় দিচ্ছ? কথা বলতে জানে না—'

অপ্রতিভভাবে শিবব্রতবাবু চুলে হাত বুলিয়ে কৈফিয়তের সুরে বললেন, 'কী করব মা। আসে যে। দাবাটা ও খেলেও ভালো। আর, আমাকেও তো

একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে।' এমন করুণ চোখে শিবব্রত মেয়ের দিকে তাকালেন, নীলার মুখে কথা এল না। ছাতে কাপড় শুকোতে দিতে চলে গেল।

৬

ছাতের কার্নিশ থেকে ঝুঁকলে গলির মোড় পর্যন্ত দেখা যায়। কাল রাত্রে বৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু আজও মেঘ কাটেনি। কিনু গোয়ালার পিচ গলে কাদা হয়ে গেছে।

কলেজে যাবার বেলা হয়ে এল, তবু নীলার নিচের স্যাঁতসেতে ঘরে নামতে ইচ্ছা করছে না। আহা একটু হাওয়া গায়ে লাগুক, একটু চড়া রোদ।

গলির মুখে গাড়ী থামিয়ে নামলেন অবিনাশ। মোটর ঢুকবে না। হাতে কোঁচা, পায়ে পাম্প-শু, হাতের মালপত্র সামলাবেন কী করে। এদিক ওদিক তাকালেন, বিব্রত গলায় ডাকলেন, 'কুলি।'

একটা ঝাঁকা মুটে এগিয়ে এল। তার মাথায় মালপত্র তুলে দিয়ে অবিনাশ কতকটা নিশ্চিন্ত হলেন। রুমাল দিয়ে মুখ মুছলেন। তারপর গাড়ির দরজা বন্ধ করে রাস্তায় নামলেন।

তারপর কুলির পিছনে আসতে বলে হাতে কোঁচা নিয়ে সাবধানে পা টিপে টিপে এগোতে লাগলেন।

আজ গায়ে কাশ্মীরী শাল জড়িয়ে এসেছেন অবিনাশ, দশ-আঙুলে ছ'টা আংটি, নেহাৎ রোদ্দুর নেই আকাশে নইলে ছ'টা আঙুলের জ্যোতি ঠিকরে পড়ত। এর মধ্যে আবার আছে মন্তঃপূত আংটি তিনটে। দুষ্প্রাপ্য পাথর—একটা লক্ষ্মীকে বেঁধে রেখেছে, আরেকটা দীর্ঘায়ু দেবে বলে প্রতিশ্রুত। তৃতীয়টা—তৃতীয়টা এক অবধূতের কাছ থেকে পাওয়া ; ওটাতে পুনর্যৌবনের আশ্বাস।

পা পিছলে যেতে যেতে অবিনাশ সামলে নিলেন। যা কাদা। আর ভাঙা ডাস্টবিনের তলা দিয়ে জঞ্জাল চুঁইয়ে চুঁইয়ে নোংরা জল সমস্ত গলিময় ছড়িয়ে পড়ছে। সদ্য পালিশ করা ছিল পাম্প্‌-শুটা, পালিশ চুলোয় যাক, এখন কাদা সুখতলায় ঢুকে চপ চপ করছে ; যাক ও-বাড়ি গিয়ে পা ধুয়ে নিলেই চলবে। কোঁচাটা না হয় হাতে হাতে সামলানো গেল, কিন্তু কাদা ছিটকে ছিটকে কাছাটার অবস্থা কী হয়েছে, ঘাড় ফিরিয়ে দেখবার সাহসও নেই।

পথ ফুরিয়ে এল। এই তো ছয়ের ডি, ছয়ের ই-র পরেই ছয়ের এফ। ওই তো ছাদের কার্নিশে কে একটি মেয়ে ঝুঁকে আছে। আকাশে এত আলো নেই যে চোখ ঝলসে যাবে। তাই অবিনাশ চিনতে পারলেন, নীলা। অমিতার ননদ,—সেই যে কলেজে পড়া ভালো গান গাইতে পারা মেয়েটি।

ওপরের দিকে তাকাতে তাকাতেই সদরের চৌকাঠ ডিঙোবেন বলে পা বাড়িয়েছিলেন অবিনাশ। হোঁচট খেলেন। একেবারে গড়িয়ে পড়লেন না।

একপাটি জুতো শুধু আলগা হয়ে ছিটকে পড়ল, কোঁচাটা হাত ফসকে কাদা মাখল খানিকটা—ঠিক যেখানে যত্ন করে গিলে করা ছিল। আর—

আর মুখটা হাঁ হয়ে যাওয়ায় বাঁধানো দাঁতের ওপরের পাটি আলগা হয়ে বেরিয়ে পড়ল,—রাস্তায় নয়, কেন না অবিনাশ হাত বাড়িয়ে সেটাকে ধরে ফেললেন। তারপরে মুখটাকে হাঁ করে রেখেই সেটাকে মাড়িতে যথাস্থানে সেট্ করতেও কিছু সময় লাগল।

ত্রস্ত চোখে অবিনাশ আরেকবার ওপরের দিকে তাকালেন। মেয়েটা তখন থেকে ঝুঁকে আছে কার্নিশ থেকে। দেখে ফেলেনি তো।

সেটা ভালো করে বোঝবার জন্যই অবিনাশ যেন খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন, একদৃষ্টিতে। মনে হল মেয়েটি যেন হাসি চাপতে পেছন দিকে মুখ ফেরালে। বলা বাহুল্য, হাসিটা বিদ্রূপের।

অমিতা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়েছিল। মুটে ঝাঁকা নামাতেই খুশি খুশি মুখে বললে, 'এ-সব কী এনেছেন কাকাবাবু।'

ছাদ থেকে নেমে এসে নীলা অমিতার পেছনে দাঁড়িয়েছিল। সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে অবিনাশবাবু কৃতার্থ গলায় বললেন, 'রেডিও, মা। ব্যাটারি সেট্।'

'ওমা, তাই নাকি।' অমিতা ছলছল করে উঠল যেন, 'আপনার এত কথাও মনে থাকে। সেই কবে কথা দিয়ে গিয়েছিলেন—'

'কথা দিলে আমার নড়চড় হয় না মা।' অবিনাশবাবু বললেন। আর একবার নীলার দিকে তাকাতে গিয়ে অজ্ঞাতসারেই একটা হাত নিজের থুঁৎনির কাছে উঠে এলো। দাঁতের পাটি ঠিক আছে তো। নীলার চোখে চোখে তাকালেন। না, মুখের রেখায় কোন বৈলক্ষণ্য নেই, চোখের স্বচ্ছ নীল মণিতে নেই কৌতুকের লেশও। কিন্তু মনে মনে হাসছে কিনা বুঝবেন কী করে। চশমাটা নতুন, পাওয়ারও ঢের, কিন্তু চোখ দুটো তো আটচল্লিশ বছরের পুরোনো। আঠারো উনিশ বছরের মেয়ের মনের খবর পড়া কি চালসে-চোখের কর্ম।

আরেকবার থুঁৎনিতে হাত দিলেন অবিনাশ। ঠিকই আছে।

দেবব্রতের সঙ্গে বিজনেস্ ঘটিত আলাপ দু' কথায় সারা হল। তারপর একটা বালিশ বুকের কাছে টেনে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অবিনাশ চোখ বুঁজে ফরমাস করলেন, 'গান শুনব এবারে।'

দেবব্রত নীলাকে হাঁক ডাক করতে শুরু করল। নীলা ঘরে ঢুকল না। দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই বলল, 'আমার ক্লাশ আছে।'

'ক্লাশ? ক'টায় ক্লাশ। কিসের ক্লাশ। একখানা তো মোটে গান। কতটুকুই বা সময় লাগবে।'

'রেডিও তো এনেছেন। তাই শুনুন না।'

একটু আগে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে গেছে, অবিনাশ মুখটা বেশি ফাঁক

করে হাসতে ভরসা পেলেন না। 'কী যে বলো। কিসে আর কিসে। রেডিও হাজার হলেও যন্তর—মন্তর কি আর আসল গলার মত মিঠে লাগে। তা ছাড়া যাই বলো, গাইছে একজন কোথায় কত দূরে শুনছে আর একজন পাঁচ সাত পঞ্চাশ মাইল দূরে বসে ; চোখে দেখা নেই, কানে শোনাটুকু আছে, ওতে ঠিক জমে না। মনে সাড়া ওঠে না।

'নটা বেজে গেছে। স্টেশন তো এখন বন্ধ।' অমিতা স্মরণ করিয়ে দিলে।

গান অবশ্য গাইলে নীলা। গুনে একখানা। তদ্‌গত হয়ে শুনছিলেন অবিনাশ। নীলাকে উঠে দাঁড়াতে দেখে একটু কাশলেন। একটা কথা পাড়বেন। সেই জন্যে ইতস্তত।

অমিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি মা, আমি খান চারেক পাশ এনেছিলুম যে সিনেমার। আজ বিকেলের। তা তোদের কি সময় হবে?'

'সত্যি কাকাবাবু, সত্যি?' খুশিতে হিল্লোলিত হল অমিতা। 'কী বই কাকাবাবু? উঃ কতদিন যে সিনেমা দেখি না।'

অবিনাশ একটা নাম বললেন। শুনে আরেকবার হিল্লোলিত হল অমিতা।

'"সিঁদুর সন্ধ্যা" ছবিটা? কতজনের কাছে যে প্রশংসা শুনেছি। আজকেই সন্ধ্যার ট্রিপ?'

'আজকেই।' হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে অবিনাশ নীলার দিকে চাইলেন। 'তুমিও আসছ তো?'

'না।'

না। কোঁচাটায় কাদা লেগেছে, নইলে অবিনাশ চট্ করে মুখের ঘাম মুছে নিতেন।

দেবব্রত ভ্রু কুঞ্চিত করে বললে, 'কেন?'

অধৈর্য গলায় নীলা বললে, 'বললুম না, ক্লাশ আছে।'

'ক্লাশ আছে? সে-তো চারটে সাড়ে চারটে অবধি। সন্ধ্যার সময় তুই করবি কী?'

অবিনাশ বললেন, 'তুমি বরং কলেজের গেট-এ থেকো। আমরা যাবার পথে তোমাকে তুলে নিয়ে যাব।'

'না।' নীলা আবার বললে. 'আমার সিনেমা ভাল লাগে না।'

অবিনাশ সঙ্গে সঙ্গে সায় দিলেন, 'সে-তো লাগবেই না? লাগবেই না। বাঙলা ছবি কি আবার একটা ছবি। তুমি কি ইংরেজি ছবি দেখ? বেশ, তবে এক দিন ইংরেজি ছবিই দেখা যাবে।' হেসে কতকটা গর্বের সুরে বললেন, 'আমি ইংরেজি ছবিরও পাশ পাই। সব সিনেমাতেই আমার কারবারের স্লাইড আছে কি না। তবে একদিন পাশ নিয়ে আসা যাবে, কী বলো।'

'আসবেন তো। সে তখন দেখা যাবে।' নীলা নির্বিকার গলায় বললে। তারপর চলে এল সেখান থেকে।

অমিতা বলে উঠল, 'তাহলে আজ বিকেলে কাকাবাবু?'

অবিনাশ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বড্ডো বেলা হয়ে গেল। আজ

অফিসে যেতে দেরি হবে। কতক্ষণে সব চুকিয়ে ছাড়া পাব, কে জানে।' হাই-তোলা ক্লান্তকণ্ঠে অবিনাশ বললেন, 'দেখি যদি পারি আসব।'

ওদিকে দেবব্রত নীলার কাছে গিয়ে তর্জন শুরু করেছে।

'তোর কি একটুও ভদ্রতা বোধ নেই নীলি।'

নীলা খেতে বসেছিল। গ্রাসটা হাতে রেখেই বললে, 'কেন দাদা। কী করলুম।'

'কী করলিনে বল? কাকাবাবু আমাদের ভালোর জন্যে এত করছেন। এক কথায় একটা রেডিও এনে দিলেন, আর তাঁকে তুই কিনা বারবার অপমান করলি? গান গাইতে 'না', সিনেমায় যেতে 'না'—'

জল খেয়ে গলার গ্রাসটাকে ভেজাতে নীলা হাসল।

'তাই তো দাদা, ভারি অন্যায় হয়ে গেছে। এবারে তোমার কাকাবাবু এলে প্রথমে গলায় আঁচল জড়িয়ে ওঁর কাছে মাপ চেয়ে নেব। তারপরও ওঁর হাত ধরে গট গট করে সিনেমা-থিয়েটার দেখতে বেরিয়ে যাব। কেমন, হল ত?'

দেবব্রতর চোখের দৃষ্টিতে আগুন থাকলে নীলা ছাই হয়ে যেত। অনেক-ক্ষণ একভাবে অপলক চেয়ে থেকে দেবব্রত বললে, 'তোর সবটাতেই ঠাট্টা। কাকাবাবু আর এ বাড়িতে এলে তো।'

'আসবেন দাদা আসবেন।' নীলা বললে, 'রাগ করেই থাকেন যদি, তবে অন্তত ওঁর রেডিও ফেরৎ নিতে আসবেন। তুমি এবারে যাও তো। মেয়েদের খাবার সময় সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে নেই।'

দেখা গেল নীলার কথাই ঠিক।

ঠিক দু'দিন যেতে না যেতেই একদিন সকালে জনকয়েক রাজমিস্ত্রি চূণ, বাঁশ, ইত্যাদি নিয়ে হাজির। কী ব্যাপার। না ওপরের দু'খানা ঘর চূণকাম করতে হবে। কে পাঠিয়েছেন। না অবিনাশবাবু।

দেবব্রত হাসতে হাসতে নীলাকে বললে, 'দেখলি তো, কাকাবাবুর সব রাগ এরি মধ্যে জল হয়ে গেছে।'

নীলাও মুচকে হাসল, 'সব রাগ চূণ হয়ে গেছে বলো।'

দেবব্রত বুঝলে বোনের এটা রাগ নয় রসিকতা। সেও হাসল। 'কাকা-বাবু বড়ো আত্মভোলা মানুষ। তুই দেখিস।'

অবিনাশ অবশ্য তারপরেও দিন সাতেক এলেন না।

শেষ পর্যন্ত দেবব্রত একদিন দুপুরে সকাল সকাল খাওয়া দাওয়া সেরে স্ত্রীকে নিয়ে বেরুল। জানা দরকার কাকাবাবু আসছেন না কেন, জানা দরকার এখনো ওঁর মনে অভিমানের কাঁটা ফুটে আছে কিনা। আর সব চেয়ে বেশি দরকার বিজনেস সম্পর্কিত ব্যাপারটার একটা বোঝাপড়া।

কলেজ ছুটি ছিল, দুপুরটা নীলা পড়ে পড়ে ঘুমিয়ে কাটাবে ভেবেছিল। হঠাৎ অবিনাশকে দেখে বিস্মিত হয়ে গেল।

আজকের পোষাকটা কিছু অদ্ভুত অবিনাশের। একটা গরম কাপড়ের আজানু কোট পরেছেন, পায়ে মোজা, গলায় কম্ফর্টার। চোখ ফোলা ফোলা ঈষৎ রক্তিম। এসে অবধি অবিনাশ কেবল কাশছেন, কথা বলতে পারছেন না, রুমাল বার করে নাক ঝাড়ছেন।

বললেন, 'অমিতা কই, দেবু কই।'

'বাঃ রে আপনি জানেন না! ওরা আজ ন'টা দশটার সময় আপনারই ওখানে গেল যে।'

রুমাল নাকের সমুখে এনে অবিনাশ সবে হাঁচতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ওঁর হাঁচি বন্ধ হয়ে গেল।

'বলো কী। আমার ওখানে?'

'আপনার সঙ্গে দেখা হয়নি?'

'না-তো। আমি আজ খুব সকাল সকাল বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। কতগুলো জরুরি কাজ ছিল কিনা। কিন্তু এ-তো ভারি মুশকিল হল নীলা, আমি ওদের দুজনের জন্যে দুখানা পাশ এনেছিলুম যে।'

'দুখানা পাশ মোটে?' কৌতুকে উজ্জ্বল হল নীলার মুখ। 'দুখানা কেন?'

'তুমি তো আর যেতে না।'

গলাটা সর্দিতে ভারি, অবিনাশের কথাগুলো অভিমানের মতো শোনালো।

নীলা চট করে মনে মনে কী ভেবে নিয়ে বললে, 'কী ছবি, শুনি?'

অবিনাশ একটা সাহেব পাড়ার ছবিঘরের নাম করলেন, দু' সপ্তাহ ধরে সেখানে একটা নামকরা ছবি চলছে।

অবিনাশ বললেন, 'সেদিন ওরা দু'জনে তো যেতেই চেয়েছিল। অথচ যাওয়া হল না। আজ তাই নিয়ে এলাম খান দুই পাশ। যাক, কী আর হবে। নষ্ট হবে, এই তো?'

নীলা বললে, 'নষ্ট হবে কী বলছেন। চলুন না আমরা যাই।'

কানের অর্ধেক কম্ফর্টারে ঢাকা ছিল, অবিনাশের সন্দেহ হল ভুল শুনলেন। 'কী বললে, তুমি যাবে?'

'যাব বৈকি', নীলা হাসল 'আপনি এই শরীর নিয়ে কষ্ট করে এসেছেন, পাশ দুটো নষ্ট করা কি ঠিক হবে?'

শরীরের কথায় অবিনাশ নিজের পোষাকের দিকে তাকালেন। সত্যি আজকের মতো অবিন্যস্ত তাঁকে কখনো দেখা যায় নি। বয়সের দোষই এই, এমনিতে এক রকম চলে যায়, কিন্তু বর্ষা আর শীতে বড়ো কাবু করে ফেলে। নইলে আজো তিনি যত্ন করেই কলপ দিয়েছিলেন, গোঁফের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম করেই ছাঁটা, তবু ঠিক স্বস্তি হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, কানের পাতার ওপর যে পাকা চুলটা ছিল, সেটা মনের ভুলে রয়েই গেছে, নাসারন্ধ্রের ভেতর থেকে কাঁচা পাকা যে চুলটা মাঝে মাঝে উঁকি দেয়, সেটাও।

ঘড়ির দিকে চেয়ে বললেন, 'যাবে ? চলো তা হলে। আর বেশি সময় তো নেই। ম্যাটিনি।'

'এখনো অনেক সময় আছে।' নীলা সহজ ভঙ্গিতে বললে, 'দাঁড়ান, আপনাকে এক পেয়ালা চা করে দি।'

আদা দিয়ে যত্ন করে এক পেয়ালা চা তৈরি করে অবিনাশকে দিলে। অবিনাশ গোঁফ না ভিজিয়ে চুমুক দিতে চেষ্টা করতে লাগলেন, নীলা সেই ফুরসতে তৈরি হতে গেল।

মা ঘুমুচ্ছিলেন, ডেকে তুলে বলল, 'আমি একটু বেরুচ্ছি মা।'

নিভাননী চোখ মেলে বললেন, 'কোথায়, কলেজে ?'

'না, এমনি একটু। সিনেমায়।'

কার সঙ্গে, কোথায়, ভেঙে বললে না। অবিনাশকে এসে বললে, 'চলুন।'

অবিনাশ বললেন, 'সে কি, তুমি এই পোষাকে যাবে ? একটা গরম স্কার্ফ পর্যন্ত নেই ! ঠাণ্ডা লাগবে না ?'

হালকা গলায় নীলা হাসল। 'স্কার্ফ পাব কোথায় যে নেব। এত কথায় কথায় আমার ঠাণ্ডা লাগে না, চলুন।'

পাতলা শাড়িটাই শোভন ভাবে জড়িয়ে একটি মেয়ে গর্বিতভাবে পা ফেলে যাচ্ছে, ওর পাশে পাশে হাঁটতে অবিনাশের নিজেকে আরো জবুথবু স্থবির মনে হল। বাইরে আরো কনকনে হাওয়া, শরীরটাকে আরো ভালো করে ঢেকে ঢুকে নিলেন অবিনাশ। গলি ফুরোলে তাড়াতাড়ি মোটরে ঢুকতে পেলে বাঁচেন !

কলেজের মেয়েদের মুখে নাম ডাক শুনে ভেবেছিল, খুব সীরিয়স গোছের মনস্তত্ত্বমূলক কোন ছবি হবে। এসে দেখল, তা নয়। অত্যন্ত হাল্কা ছবি ; আবেদনটা মুখ্যত চমকপ্রদ দৃশ্যপটের এবং কয়েকটি মধ্যবয়সী, স্বাস্থ্য-কঠিন মেয়ের অঙ্গসৌষ্ঠবের। প্রতিটি ফুট জুড়ে উত্তেজনা,—সস্তা কিন্তু তীব্র। উপরি হিসাবে আছে অন্তরীক্ষে বিমানযুদ্ধ, স্থলে রেলদুর্ঘটনা, জলে কয়েকটি তরুণীর লীলায়িত ভুজভঙ্গিমা।

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ মাঝে মাঝে দর্শকদের উচ্চহাসিতে কেঁপে উঠছে। সবাই হাসলে অবিনাশও হাসছেন, মাঝে মাঝে উত্তেজনার আতিশয্যে হাত-তালিও দিচ্ছেন।

কিন্তু শেষের দিকে একটা দৃশ্যে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেললেন। সুন্দরী অভিনেত্রী ক্লারা ডেভিস সাগরজলে স্নান সেরে সবে সজল এলো চুলে তীরে উঠে এসেছে। মর্মরশুভ্র দেহ, রঞ্জিত নখাগ্রে সূর্যকিরণ ঠিকরে পড়ছে, অল্প অল্প জলকণা তখনো লেগে আছে চোখের পল্লবে, পেশিপেলব বাহুমূলে, অনিন্দ্যভঙ্গিম গ্রীবায়। সংক্ষিপ্ততম বাসটুকুও পরিত্যাগ করবে বলে হাত বাড়িয়েছে।

ছবিতে শুধু ইঙ্গিত মাত্রই ছিল। অবিনাশের তখন ক্ষিপ্ত হতেই বাকি।

হঠাৎ পাশের সীটের হাতলটা শক্ত মুঠিতে ধরে নীলার কানের কাছে মুখ এনে ফিস ফিস করে বললেন, 'কেমন লাগছে ?'

নীলার ওপাশে আবার একজন ফিরিঙ্গি ছোকরা, সরে বসবার উপায় নেই। তবু যতটা পারল নিজেকে গুটিয়ে নিলে।

তারপরে যতক্ষণ বই চলল, অবিনাশ সমানে সবার সঙ্গে তারিফ করতে লাগলেন। গানের সময় হাতলের উপর তাল দিলেন, নাচের সময় পাম্প-শু দিয়েই সিমেন্টের মেজেয় ঠুকলেন পা।

সেদিন নীলা মনে মনে নিজের সঙ্গে একটা আপোষ করে নিলে। এই নখদন্তহীন স্তিমিতপৌরুষ ধনীর সঙ্গে অসদ্ব্যবহার করে লাভ কী। কোন ক্ষতি তো করতে পারবে না, দু'একখানা গান শুনবে, সিনেমায় নিয়ে আসতে পারলে কৃতার্থ হয়ে যাবে। শরীর খারাপের ছুতো করে মাঝে মাঝে এসে আদামেশানো চা খেতে চাইবে। তার বেশি কী।

বাসায় ফেরবার পথে অবিনাশ বললে, 'তুমি ইংরিজি গান জানো না ?' অর্থাৎ তখনো ওঁর চেতনায় প্রেক্ষাগৃহের সুরভি ভুরভুর।

'বাংলাই ভালো জানিনে।' নীলা বললে, 'শিখতে পেলাম কই।'

'গানের স্কুলে ভর্তি হলেই পারো ?'

'গানের স্কুল ? আমার কলেজের মাইনে দু মাস বাকি পড়েছে জানেন ?'

'পড়েছে নাকি ?' অপ্রতিভ হয়ে অবিনাশ পকেট হাতড়াতে লাগলেন। যেন এখুনি নীলার দু মাসের মাইনেটা দিয়ে দেবেন। তারপর হঠাৎ জোর গলায় বলে উঠলেন, 'তুমি গানের স্কুলে ভর্তি হয়ে যাও। আর কিছুর জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।'

'সত্যি বলছেন ?' নীলার চোখের মণি চিকচিক করে উঠল।

'তোমার গলা আছে, সুরজ্ঞানও আছে। শুধু গানের সায়ান্সটা। তুমি দু দিনে শিখে নেবে। তারপর রেডিও, রেকর্ড—তুমি কিছু ভেব না। আমি আছি, সব ঠিক করে দেব।'

আগে হলে নীলা চটে যেত, শুনিয়ে দিতো ঝাঁঝালো দু'চার কথা। কিন্তু ওর মেজাজ ভালো আছে। যেন মজার খেলা পেয়ে গেছে একটা। বললে, 'তা হলে এ-মাস থেকেই ভর্তি হয়ে যাই, কী বলেন।'

চাকার নিচে পলাতক পিচের পথের দিকে তাকিয়ে নীলা নিজের মনেই হাসল। দেখাই যাক না। ভাবল, জিজ্ঞাসা করে অমিতার মতো দুঃস্থ ভাইঝি আর ক'জন আছে অবিনাশের। তাদের কলেজে পড়া ননদ আছে কি না, নীলার মতো।

উপরে না উঠে নীলা সেদিন প্রথমে গেল শান্তিদের ঘরে।

শান্তি আর ইন্দ্রজিৎ বাঘবন্দী খেলছিল। শান্তি বললে, 'এসো ভাই। কোথায় গিয়েছিলে ?'

'সিনেমায়।' তক্তপোষের একপাশে ধুপ করে বসে হাতপাখায় হাওয়া খেতে

খেতে নীলা জবাব দিলে।

ইন্দ্রজিৎ বললে, 'আপনাকে আসবার সময় আমি দেখেছি। মোটরে যাচ্ছিলেন, না? সঙ্গে একজন বুড়ো মতন ভদ্রলোক ছিলেন।'

'কে ভাই?' শান্তি শুধোলে।

নীলা বললে, 'বৌদির কাকা।'

'আমার ভারি অদ্ভুত লাগছিল ভদ্রলোককে।' ইন্দ্রজিৎ বললে, 'ভদ্রলোক শীতের ভয়ে একেবারে জড়োসড়ো; পারলে বুঝি লেপমুড়ি দিয়ে বেরুতেন। তার পাশে আপনি—একেবারে স্বচ্ছন্দ, উদ্ধত, নিঃশঙ্ক।'

শান্তি বললে, 'তারপর কী ছবি দেখলে ভাই, বলো। গল্পটাও বলে দাও।'

দু'চার কথা বলতে না বলতেই শান্তি উঠে দাঁড়াল। 'আমরাও যাব ছবিটা দেখতে।'

'খেলাটা শেষ হোক।' ইন্দ্রজিৎ আপত্তি করল।

একটানে ঘুঁটিগুলো এলোমেলো করে দিয়ে শান্তি বললে, 'আর খেলে না। আপনি তো হেরে গেছেন। আমাকে আর বন্দী করতে পারলেন কই।'

'ইন্দ্রজিৎবাবু বুঝি ছাগল হয়েছিলেন?'

'আবার কী হবে ও।' শান্তি হাসতে হাসতে বললে।

'আর আপনি বাঘ?'

'বাঘ নয়, বাঘিনী বলো! চলুন কবিবর।'

'আর সময় কোথায় আজ সিনেমার?' ইন্দ্রজিৎ বললে, 'সাতটা তো বেজে গেছে।'

'কেন রাত্তিরে শো নেই?'

'মণিদা এখনো বাসায় আসেননি—'

'এর মধ্যে এসে পড়বেন। না এলেও, ওঁর কাছে চাবি আছে, তালা খুলে ঢুকতে পারবেন। একটা চিঠি না হয় লিখে যাব। আপনি উঠুন তো। অনেক ওজর আপত্তি শুনেছি। বরং এখুনি গিয়ে টিকিট কিনে আনুন। এরপরে গেলে আর পাবেন না।'

শান্তির চোখের দিকে তাকিয়ে ইন্দ্রজিৎ আর আপত্তি করতে ভরসা পেলে না। তাড়াতাড়ি স্যাণ্ডাল জোড়া কোনক্রমে পায়ে গলিয়ে বেরিয়ে পড়লো।

দোতলায় উঠে নীলা দেখল, বৌদি এসেছেন।

'কোথায় গিয়েছিলে ভাই?'

সে-কথার জবাব না দিয়ে নীলা বললে, 'তোমরা কোথায় গিয়েছিলে তাই বলো।'

'সিনেমায়।'

'সিনেমায়!' সঙ্গে সঙ্গে নীলা প্রতিধ্বনি করে উঠল।

'কাকাবাবু পাশ দিলেন যে। সেই "সিঁদুর সন্ধ্যা" ছবিটারই। কী ভালো যে হয়েছে ঠাকুরঝি, কি বলব। আমি তো সারাক্ষণ কেঁদেছি, আর

তোমার দাদা পাশে বসে আমাকে ধমকেছেন।'

নীলার মাথায় কেমন দুষ্টুমি খেলে গেল। জিজ্ঞাসা করলে' 'তোমার কাকাবাবু যাননি ?'

'কোথায় আর যেতে পারলেন! যাবেন বলে সব ঠিকঠাক, এমন সময় অফিস থেকে জরুরি ফোন এল। গাড়ি নিয়ে ছুটতে হল হুগলী।'

'হুগলী! তখুনি হুগলী গেলেন বুঝি ?' হাসি চাপতে নীলাকে রীতিমত বেগ পেতে হচ্ছিল।

'তখুনি। খেয়ে উঠে জিরোতে পারলেন না পর্যন্ত। ভালো কথা ঠাকুরঝি, আসছে মাস থেকে তোমার দাদা তো কাকার ওখানেই কাজ করবেন। আজ কথাবার্তা মোটামুটি ঠিক হয়ে গেল। তোমার দাদা কালকেই এখানকার অফিসে নোটিশ দিয়ে দেবেন। ভালো হল না ?'

'খুব ভালো।'

নীলা আর একটু উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে বোধ হয় আশা করেছিল অমিতা। একটু ক্ষুণ্ণ হয়েই যেন জোর দিয়ে বলল, 'ভালোই তো। সেধে এমন সুযোগ কেউ কাউকে দেয় নাকি। অগন মনভোলা মানুষ, তাই। নইলে, আমরা তো মনে করেছিলাম কত কিছু না জানি মনে করে বসে আছেন। কিচ্ছু না। শেলট যেন ধুয়ে মুছে গেছে। আমাকে শুধু হেসে বললেন, তোর ননদ ছেলেমানুষ অমি, তায় কলেজে পড়ে, একটু তেজী। ওর কথায় মনে কিছু করব, আমাকেও কি ছেলেমানুষ পেলি!'

ওদিকে তখনো পথে পথে ঘুরছে ইন্দ্রজিৎ। বার তিনেক এই গলিটাই চক্কর দেওয়া গেল। পার্কে ঘাস নেই, বেঞ্চে ধুলোকাদা ভাত, বসবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে পকেটে হাত দিচ্ছে,—খালি পকেট ; দু'একটা বিড়ি শুধু উঠে আসছে।

এ কি পরীক্ষায় তাকে আজ ফেলেছেন শান্তি বৌদি। সিনেমায় যেতে তারই কি অসাধ। কিন্তু মাসের শেষ, মেসে শেষ পাইটি অবধি হিসেব করে নিয়েছে, পকেটে কিচ্ছু নেই কলেজের মাইনে বাকি ফেলে ডাইং ক্লিনিং থেকে কাপড় কাচানো চলেছে। অন্তত ভদ্র হয়ে বেরুনো চাই তো।

সাড়ে সাতটা বাজল। আর অপেক্ষা করা চলে না। এর পরে কিন্তু গোয়ালার গলির ছ'য়ের এফ বাড়িটার একতলার দরজা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যাবে ইন্দ্রজিতের কাছে।

শান্তি বৌদিকে সব কথা খুলে বললে কেমন হয়। শেষ পর্যন্ত ভীরু ভীরু পায়ে ইন্দ্রজিৎ আবার গলিতে ঢুকল। জিম্‌ন্যাসটিকের আখড়া, তারপরেই একটা গ্যাসের আলোর পাশে দোকান। ইন্দ্রজিৎ সাইন বোর্ডটা পড়ল : "প্যারিস জুয়েলারী"। টিমটিমে আলোয় একটা লোক গভীর মনোসন্নিবেশ করে কাজ করছে। কী ভেবে ইন্দ্রজিৎ দোকানের সিঁড়িতে পা দিলে।

'আসুন, আসুন।' উঠে দাঁড়িয়েছে প্রমথ পোদ্দার। 'কী চাই ?'

চট করে বুক পকেটে হাত দিয়ে ইন্দ্রজিৎ কলমটা বার করে পোদ্দারের সামনে ধরল। অনেক কেশে অনেক সঙ্কোচের বাধা ঠেলে এক নিশ্বাসে বলে উঠল, 'এটা বাঁধা রেখে কিছু টাকা দিতে পারেন?'

'দেখি।' কলমটা হাতে নিয়ে আলোর সামনে গিয়ে পরীক্ষা করতে লাগল প্রমথ। বোঝা গেল না মুখ টিপে হাসছে কিনা। তারপর গম্ভীর গলায় বললে, 'হুঁ'। দামি কলমই তো মনে হচ্ছে।'

'দেবেন তা হলে টাকা?' অসহ্য আশায় ইন্দ্রজিতের গলা কেঁপে গেল, 'বেশি নয়, এই গোটা—'

'না।' কলমটা ইন্দ্রজিতের হাতে ফিরিয়ে দিয়ে প্রমথ বললে, 'না। এটা সোনারুপোর দোকান মশাই, কলমটলম আমরা বাঁধা রাখি না।'

এক ফুঁয়ে যেন নিভে গেল ইন্দ্রজিৎ। একটু পেছনে সরে দরজার কবাটে হাত রাখল।

'কলম বাঁধা রাখেন না?'

'না মশাই। এ-সবের বাজার আলাদা। আমাদের কাজ শুধু সোনা নিয়ে, চাঁদি নিয়ে।'

এক মুহূর্ত কী ভাবল ইন্দ্রজিৎ। তারপর একটানে অনামিকা থেকে আংটি খুলে প্রমথর হাতে তুলে দিল। 'তবে এইটে নিন। বাঁধা-টাধা নয়, কিনেই নিন আপনি।'

আবার আলোর নিচে গিয়ে বসল প্রমথ, ধীরে সুস্থে নিকষ পাথরে গোটা কতক দাগ কেটে বলল, 'হুঁ। খাঁটিই মনে হচ্ছে। তা এটা বেচবেন?'

ওদিকে অসহিষ্ণু হয়ে মেজেয় পা ঘষতে শুরু করেছিল ইন্দ্রজিৎ। '—বেচব। কত হবে তাড়াতাড়ি বলে দিন।'

'দাঁড়ান মশাই। এ-সব কাজ কি অতো তাড়াতাড়ি হয়।' ছোট ছোট ওজনের যন্ত্রপাতি বের করল প্রমথ। রুপোর সিকি, আধুলি, দু'আনি, রতি। আংটি চড়ায় পেতলের পাল্লায়, আবার নামায়, নানারকম হিসাব করে, মনে মনে বিড় বিড় করে বললে, 'চার আনা দু'রতি সোনা আছে। আজ সোনার দাম হল গে—আমার তা হলে পড়ল গে—'

সে জটিল অঙ্ক ইন্দ্রজিতের মাথায় ঢোকার কথা নয়। টাকাটা হাতে নিয়ে সে ছুটতে পারলে বাঁচে। বললে, 'দিন তা হলে। আংটিটার প্যাটার্ন বড়ো সেকেলে হয়ে গেছে। তাই বেচে দিচ্ছি।'

ইন্দ্রজিৎ বেরিয়ে যেতে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে আবার আলোর সমুখে বসল প্রমথ। আংটিটা নাড়াচাড়া করল বারকয়েক। হাসল মনে মনে। ইন্দ্রজিৎকে সে চিনতে পেরেছে। এই ছোকরাই না ছ'য়ের এফ বাড়িটায় আনা-গোনা করে? সেদিন ও-বাড়ির বৌটাকে নিয়ে ভিজতে ভিজতে অনেক রাতে বাড়ি ফিরেছিল, এই না? অনেক দেখেছে প্রমথ, অনেক দেখবে।

প্যাটার্নটা পুরোনো হয়ে গেছে। তাই বেচতে এসেছি! প্রমথ বাক্সটায় আংটিটা তুলে রাখতে রাখতে ভাবলে, এ সব ফাঁকা পকেটের চালিয়াতি সে

কত শুনেছে। মরে গেলেও বলবে না, টাকার টানাটানি, তাই এসেছি।

প্যাটার্ন পুরোনো হয়ে গেছে। আরে, কার চোখে ধুলো দিবি তুই। পুরোনো হয়ে গেছে তো নতুন করে তৈরী কর। আরেকটু সোনা দে,—খাসা জিনিস হবে। বিক্রী করতে আসিস কেন।

৭

একে একে লোকজন বাড়ছে কিন্তু গোয়ালার গলিতে। ফোঁটা ফোঁটা করে মধু জমার মতো।

একটার পর একটা দীপ নিবেছিল, বসাকবাবুরা নিজেরা যখন চলে গেলেন, কিন্তু ভাড়াটে বসিয়ে গেলেন না। এতদিনে বুঝি ব্যবসাবুদ্ধি হয়েছে, একে একে ভাড়াটে আনছেন। কোথাও পার্টিসন তুলে, কিংবা চটের পর্দা টাঙিয়ে।

ঘরে ঘরে আবার আলো জ্বলে উঠছে।

ছয়ের এক বাড়িটাতেই, প্রথমে নীলারা, তারপরে শান্তি আর মণীন্দ্র। ফাউ ইন্দ্রজিৎ।

ঠিক উল্টো দিকেই আর একটা বাড়ি আছে, রূপে বয়সে এ' বাড়িটারই দোসর। সেই বাড়িটাতে ক'দিন হল এসেছে শকুন্তলা।

প্রত্যেক দিন নীলা যখন ক্লান্ত হয়ে কলেজ থেকে ফেরে শকুন্তলা তখন জানালায় দাঁড়িয়ে ওকে লক্ষ্য করে। নীলা টেরও পায় না। বেলা মোটে পাঁচটা, এরি মধ্যে কুকারে রান্না সারা শকুন্তলার, চুল আঁচড়ে সে তৈরি। বুকের উপর দিয়ে আড়াআড়ি করে আঁচল টেনে শক্ত করে গুঁজেছে কোমরে। মাথায় তুলে দিয়েছে শাদা রুমালের পাল। সেবিকার অভিজ্ঞান। নববধূদের গুণ্ঠনের মতো।

হাসপাতালে নাইট ডিউটি আছে শকুন্তলার। টানা টানা দুটি চোখ। রাতের পর রাত ডিউটি দিয়ে সে চোখ দুটি মাঝে মাঝে ঝিমোয় শুধু, ক্লান্তিকালো হয় না। ট্রেতে করে সাজানো ওষুধ পরিবেশন, প্রহরে প্রহরে টেম্পারেচার নেওয়া, হাসিমুখে কুশলপ্রশ্ন, প্রয়োজনমতো সত্য গোপন করেও আশ্বাস দেওয়া, এই তো কাজ অপরূপ এক বিনিদ্র বাসর—রাতের পর রাত; একই শয্যায় একই লোকের সঙ্গে নয়; শতশয্যার সেবিকা।

ভোরবেলা, রাস্তার আলো নেবানোর সঙ্গে সঙ্গে ফিরে আসে যখন, তখন আবার একা। সকালের ভিজে বাতাসে চোখের পাতা দুটি ভারি হয়ে এসেছে, বেডকভারটা সরানোর ধৈর্যও থাকে না, এসেই শুয়ে পড়ে। এ বিছানার শরিক নেই।

মিনিট দশেক গড়াগড়ি দিলে তবে ঘুম আসবে। ঘণ্টা দুই ঘুমুলেই শরীর ঝরঝরে। এক কাপ চা খেয়ে চলে যাবে স্নান করতে; ফিরে এসে দেখবে এক চিলতে রোদ পড়েছে ঘরে। এ-ঘরেও রোদ পড়ে। সুতো কাটা ঘুড়ির মতো

দিশাহারা রোদ কখনো কখনো ও-বাড়ির ছাদ, এ-বাড়ির পাঁচিল টপকে ছিটকে এসে ঘরে পড়ে। তখন শরীরটাকে মনে হয় স্নিগ্ধ, তকতকে, ধোয়া মেজের মতো চকচকে, খোলস ছেড়ে যেন বেরিয়ে এসেছে সাপিনী।

ওই রোদে চুল মেলে বসবে শকুন্তলা, খড়খড়িটা টেনে দিয়ে সামনের বাড়ির মেয়েটিকে দেখবে। ওরও বুঝি চান করা হয়ে গেছে। এবারে কলেজে যাবে মেয়েটি। বিনুনী বাঁধছে ; বেশ প্যাটার্ন'টা, পাটির মত পরিপাটি। মনে হবে কতোই না জানি চুল। দূর থেকে বোঝা যাবে না ওর কতোটা খাঁটি, কতোটা রিবনের জুয়োচুরি। মেশানো দুধ দেখতে যেমন সাদা, রিবনবাঁধা বিনুনীও দূর থেকে তেমনি কালো।

দুপুরের খাওয়া সেরে আর এক ঘুম। পরিপূর্ণ, নিরিবিলি, নিশ্চিন্তে। কেউ নেই যে ঘুম ভাঙবে, বাচ্চা নেই যে জ্বালাতন করবে। দিনের বেলা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে শরীরটাও যেন ভরে এলো। ডানহাত দিয়ে বাঁ হাতের মণিবন্ধ চেপে ধরে শকুন্তলা। এখনও বেড় পাওয়া যাচ্ছে। আর ক'দিন পরে পাবে না। এই স্ফীতি স্বাস্থ্য নয়, নিরপচয় যৌবন এখন সুদ দিচ্ছে মেদে। প্রৌঢ় সুখী পুরুষের ভুঁড়ির মতো।

বিকেলের দিকে আসবে গীতা, ললিতা, মীনা, অণিমা, স্টেলা। এসেই হৈ চৈ শুরু করে দেবে। স্টোভ ধরাবে, গান গাইবে। একই সঙ্গে কাজ করে, কিন্তু বয়স এখনো কম ওদের। কিন্তু বড়ো রোগা। অল্প মাইনে, অপর্যাপ্ত খাটুনি। ওদের দেহে লাবণ্যের ইঙ্গিতমাত্র আছে, স্ফুরণ নেই। শক্ত করে টানা আঁচল বুকের কাছে একটুখানি ফেঁপে গেছে শুধু।

হাসপাতালের কর্তৃপক্ষকে বলে লাভ নেই। ডক্টর উপাধ্যায়—যিনি সারা ইউরোপ-আমেরিকা ঘুরে নামের শেষে উপাধির আদ্যাক্ষরের অসংখ্য উপলখণ্ড কুড়িয়েছেন, ভিজিটের অঙ্ক যার গণিতের তিনটি সংখ্যায়, তাঁকে কিছু বলতে যাবার আগে প্রস্তুত থাকতে হবে মানবিকতা সম্বন্ধে দীর্ঘ এক-ঘণ্টাব্যাপী বক্তৃতা শোনবার জন্য। নার্স'রা কল্যাণী। প্রফেসনাল নয়, মিশনারী। একটা জাতিকে তারা বাঁচিয়ে তুলছে, সুস্থ করছে। ধাত্রী। ধাত্রী কথাটার ধাতু জানো ? জানো না ? সঙ্গে সঙ্গে চটে যাবেন ডক্টর উপাধ্যায়, ওই তো তোমাদের দোষ—তোমাদেরই বা কেন, শিক্ষার অসম্পূর্ণতা। গোটা-কতক ল্যাটিন রোগ, মার্কিন ওষুধ আর টেম্পারেচার দেখতে শিখেই নার্স।

যতক্ষণ ধাত্রীজীবনের তত্ত্বকথা শোনাতে থাকেন ডাঃ উপাধ্যায় ততক্ষণ চোখ পুরোপুরি খোলেন না, আধবোজা রাখেন। আস্তে আস্তে কথা বলেন, মুখটাও হাঁ হয় না। কিন্তু যেই চটলেন অমনি মুখটা হাঁ হয়ে গেল, জিভটা বেরিয়ে এল লকলক করতে করতে। মোটা রকমের একটা জিভ পানের রসে পুষ্ট।

গীতা বলে, 'কবে এখানে সেবিকাসদন খুলবে শকুন্তলাদি, বলো না।'

শকুন্তলা বললে, 'খুলব রে খুলব, ব্যস্ত হসনে।' কনুইয়ের কাছটা ফিতে দিয়ে মাপতে মাপতে বলে, 'আরেকটু মোটা না হলে কি আর অধ্যক্ষ

হিসাবে মানাবে।'

ললিতা বললে, 'শকুন্তলাদি নার্সেস হোম খুলবে না ঘোড়ার ডিম। লুকিয়ে কবে সংসারী হবে বলেই এখানে এসে আলাদা বাসা করেছে।'

চটে যাবার ভাণ করে শকুন্তলা বললে, 'নিজের স্বপ্ন পরকে দেখাসনে। তুই বুঝি ওই মতলবে আছিস। তোর সেই মেডিকেল স্টুডেণ্টের খবর কী রে?'

এদের নিয়ে একটা নার্সেস হোম খুলবে শকুন্তলা। ছোটখাটো একটা এস্টাব্লিশমেণ্ট। নামও ঠিক হয়ে আছে: সেবাসত্র। মাসান্তে মাইনে নয় স্বাধীন জীবিকা। প্ল্যান সব ঠিক হয়ে আছে। আর কিছু টাকা চাই। তার-পর একে একে এরাও সবাই এসে যোগ দেবে। ললিতা, গীতা, অণিমা এমন কি স্টেলাও।

একটা শুধু সন্দেহ আছে। এত ছোট গলি, এখানে কি নার্সেস হোম চলবে। কে খবর পাবে, এখানে আধ ডজন মেয়ে রোগী-প্রসূতির সেবার জন্য সর্বক্ষণ তৈরী। যৎকিঞ্চিৎ টাকা পেলেই যারা খুশি।

সমস্যা আছে তো সমাধানও আছে। গলির মুখে একটা সাইনবোর্ড থাকবে, সেই সাইনবোর্ডে নাম ঠিকানা লেখা থাকবে, আঁকা থাকবে একটা হাত। সেই হাতের অঙ্গুলিনির্দেশ সেবাসত্রের নিশানা।

মেয়েরা চলে গেলে আবার সাজগোজ। আবার হাসপাতাল। আর একটি কর্তব্যনিমগ্ন রাত। আরও একটি রাত।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে শকুন্তলার ঠোঁটে হাসি ফুটল। একেবারে সাদা, সরু সিঁথি। এই সিঁথির দিকে চেয়ে কে বলবে এর ওপর দিয়েও সিঁদুরের গাঢ় একটি রেখা চলে গিয়েছিল। আজকের বর্ণহীন বর্তমানের পিছনেও ছিল রঙিন একটি অতীত। সে রঙ যত ফিকেই হোক, যত অস্থায়ী।

একই পাড়ায় বাড়ি, একেবারে মুখোমুখি দুই জানালায় ঘর। আলাপ হতে দেরি হল না। তারপর নীলা একদিন বিকেলে বেড়াতেও এল।

ঘুরে ঘুরে দেখলেও ঘরখানা। বললে, 'বাঃ, কী সুন্দর গুছিয়ে রেখেছেন।'

শুনল সেবাসত্রের পরিকল্পনা। বলল, 'আপনাদের দেখে হিংসে হয়। কেমন নিজের ভার নিজেরা নিয়েছেন। আমরা তো বাবার গলার বোঝা হয়ে আছি।'

শকুন্তলা বলল, 'ও-পার দেখে এ-পারের নিশ্বাস বরাবরই পড়ে। আপনি তো কলেজে পড়ছেন।'

'কিছু করবার নেই, তাই পড়ছি।' নীলা বললে, 'নইলে কবে দিতাম সব ছেড়েছুড়ে।'

শকুন্তলার ঘরের জানালা থেকে শান্তিদের ঘরখানা দেখা যায়। অর্থাৎ কম আলোয় যতটা সম্ভব।

শকুন্তলা জিজ্ঞেস করল, 'নিচের তলার ওই বৌটি আর আপনারা বুঝি আলাদা ভাড়াটে?'

'হ্যাঁ', নীলা বললে, 'ওরা পরে এসেছে। বেশ চমৎকার মেয়ে শান্তিদি, না?'

শকুন্তলা সোজা পথে জবাব দিলে না। 'কী জানি কেমন। আলাপ হয়নি তো। তবে খুব মিশুক দেখতে পাই। অনেক রাত পর্যন্ত ওদের ঘরে আড্ডা চলে। আমি তো কোন কোন দিন শেষ রাতেই ডিউটি থেকে ফিরি। তখনো ও-বাড়িতে তাস খেলা চলছে দেখতে পাই।'

'হ্যাঁ', নীলা বললে, 'মাঝে মাঝে ওরা খেলে। মণিদার খুব তাসের নেশা কিনা, তাই বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে আনেন।'

'মণিদা কে? ওই বৌটির স্বামীর কথা বলছেন?' শকুন্তলা বললে, 'উনি তো পার্টিসানের এ-পাশে পড়ে পড়ে ঘুমোন দেখেছি। ওঁকে তো কখনো খেলতে দেখিনি। খেলেন তো আপনার শান্তিদি।'

শান্তিদি তাস খেলেন রাত তিনটে চারটে অবধি? স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে স্টেক রেখে? নীলা যেন বিশ্বাস করতে চাইল না। 'আপনি ভুল দেখেছেন।'

'ঠিকই দেখেছি।' শকুন্তলা বললে, 'অত ভুল দেখলে কি আমাদের চাকরি থাকত ভেবেছেন। থার্মোমিটারে পয়েন্ট ডিগ্রি মিলিয়ে আমাদের রোগীর টেম্পারেচার দেখতে হয়।'

'কিন্তু—কিন্তু', নীলা একটু ইতস্তত করে বললে, 'ওঁরা তো বাজী রেখে খেলেন।'

'না হয় আপনার শান্তিদিও বাজী রেখেই খেললেন। সেকালে দ্রৌপদী পণ হয়েছিলেন, একালের দ্রৌপদী না হয় নিজেই পাশা খেলতে নেমেছেন। তফাৎ কতটুকু বলুন।'

তফাৎ অনেকখানি। নীতি, রুচি, শিক্ষার যে ছাঁচে নীলার মনের পোষাক তৈরী, তাতে রাত পুইয়ে স্বামীর বন্ধুদের সঙ্গে জুয়া খেলার কথা কল্পনাও করা যায় না। অল্পসল্প মেশামেশি, কমসম হাসাহাসি বোঝা যায়; ভদ্রতা বজায় রেখে। ভদ্রতা রাখার জন্যে। কিন্তু এ-কোন্ শান্তিদির কথা সে শুনে এল আজ। অমন মিষ্টি শান্তিদি, এমন শান্ত, তাঁর এ আবার কীরূপ। দুটো ছবি কিছুতেই মেলানো গেল না।

এমন খটকা লাগল মনে যে দিনকতক শান্তির সঙ্গে ভালো করে কথা বলতে পারল না, চাইতে পারল না চোখে চোখে। শান্তির একটা লজ্জার কথা নীলা জেনে ফেলেছে, সেও যেন একটা লজ্জা।

শেষে স্থির করল, এ লজ্জার বোঝা ফেলে দেবে। শান্তিকে জিজ্ঞাসা করবে সব সোজাসুজি।

প্রশ্নটা শুনে শান্তি কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তোমাকে সব বলব ভাই, খোলাখুলিই বলব। আজ শুধু এটুকু জেনে রাখো, মানুষ বদলায়। নইলে বিশ্বাস করতে পারবে, আমার যখন বিয়ে

হয়েছিল, তখন আমার নাকে নোলক ছিল ? পোনেরো বছর বয়সে, স্বামীকে তুমি বলতেই লেগে গেছে ছ'মাস। মুখে কথা ফুটত না, বহুদিন পর্যন্ত ওকে দিনের বেলা যা দেখেছি সে শুধু ঘোমটার ভেতর দিয়ে। গ্রামের মেয়ে, স্বপ্ন দেখেছি স্বামী চাকরি করবেন, টাকা এনে দেবেন তাকে, নিশ্চিন্তে ঘর করব, নির্ঝঞ্ঝাট। স্বামীকে যখন চিনলুম, তখন দেখি তা হবার নয়। এ অন্য ধরনের মানুষ। এটা ধরে ওটা ছাড়ে। কখনো কখনো কিছু না ধরেই ছাড়ে। বুঝে নিলাম, আমাকেও ওর মতো করেই তৈরী করে নিতে হবে, নইলে আমাকেও কবে ছাড়বে ও। বদলাতে গেলাম নিজেকে। একে একে নোলক খসল, ঘোমটা উঠল, কথা ফুটল। ঘষে ঘষে পাথর শুধু ভোঁতাই হয় না ভাই, চোখাও হয়।'

আর প্রশ্ন করল না নীলা, কিন্তু মনের ধন্দ কাটল না। চোখা শান্তিদি হয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সূচীমুখে ফোঁটা ফোঁটা করে বিষও জমছে যেন। ক্লেদ থেকে উঠতে পারছেন না, আরো যেন তলিয়ে যাচ্ছেন ক্রমে ক্রমে।

এঁরি পাশে শকুন্তলা আর ওর দলের মেয়ে কটি যেন আলাদা। ওদের অতীত জানা নেই, বর্তমান ডুবে আছে অন্ধকারের গভীরে, তবু ওরা ক'জন হাত বাড়িয়ে দিয়েছে সামনের দিকে। উজ্জ্বল, সুস্থ, আত্মনির্ভর। শকুন্তলা, গীতা, অণিমা, স্টেলা। ওরাও বদলাতে চাইছে নিজেদের। কিন্তু শান্তিদির পথে নয়।

পরের মাসের গোড়া থেকেই 'সেবাসত্রে'র উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়ে গেল। আরো দু'খানা ঘরের কলি ফেরাল শকুন্তলা। তার মধ্যে একটা অফিস ঘর। একটা টেবিল, খান দুই চেয়ার, আপাতত এই। সাইন বোর্ড, বাড়তি গোটা দুই আলো। শকুন্তলার নিজের সামান্য কিছু পুঁজি ছিল। তার ওপর দশ বিশ টাকা করে চাঁদা দিয়েছে আর সব মেয়েরা।

একমাত্র ললিতা ছাড়া। শকুন্তলা বললে, 'কিরে ললিতা, তুই কিছু দিবি না ?'

মুখটা নিবে যেন ছোট হয়ে গেল ললিতার।

'কিছু যে নেই কুন্তলাদি।'

'তোর নিজের কিছু নেই জানি। কিন্তু তোর সেই মেডিকেল স্টুডেন্টটি তো বেশ পয়সাওয়ালা শুনেছি। ওর কাছ থেকে কিছু দিতে পারবিনে ?'

কাঁচুমাচু মুখে ললিতা বললে, 'ওর এ-সবে মত নেই যে কুন্তলাদি।'

'মত নেই ?' শকুন্তলা হেসে উঠল, মেয়েদের পক্ষে প্রায় বেমানান গলায়, 'কেন হাতছাড়া হয়ে যাবি, ভয়ে ? ও তোকে বিয়ে করবে কথা দিয়েছে বুঝি ? বল-না, দিয়েছে ?'

একটি মেয়ের প্রশ্ন, বাকি সকলের সকৌতুক চোখ। ললিতা ঘামতে লাগল। জবাব দিতে গিয়ে ঠোঁট দুটোই শুধু নাড়ল। ফোটাতে পারল না।

দাবা খেলতে এসে প্রমথ শিবব্রতবাবুকে বললে, 'আর কী কিন্তু গয়লার গলি তো নবদ্বীপ হয়ে উঠল মশাই।'

'কী রকম।'

'রকম কি এক মশাই। ওরা অনেক রকমে দেখা দেন। নর্তকী, দেবদাসী, সেবাদাসী। একজন সেবাদাসী তো এসে ঘর নিয়েছেন কুসুম বাইজি বছর বিশেক আগে যে ঘরে থাকত, সেখানে। আরো ক'জন সেবাদাসী আসছেন শুনেছি।'

'সেবাদাসী?' বিস্মিত শিবব্রতবাবু চোখ তুললেন, 'ওরা তো নার্স শুনেছি।'

'আরে মশায়, নার্স মানে সেবিকা তো।' চোখ মিটমিট করে প্রমথ বলল, 'সেবিকা আর সেবাদাসী একই। থাকুন আরো কিছুদিন, কত খেলা দেখতে পাবেন। গলিতে ফীটন গাড়ি সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেল বলে। কুসুম বাইজির ওয়ারিশ তো এঁরা সব। শুধু সবুর করুন।'

আড়ালে থেকে শুনে শরীর রী-রী করে উঠল নীলার। কিছু বলতে পারল না।

৮

সেবার পুজোর ছুটির পর ইন্দ্রজিৎ দেশ থেকে ফিরে এসে সোজা উঠল এ-বাড়ি। কিন্তু গোয়ালার গলির জনসংখ্যায় আরো একজন যোগ হল। এক তলার কোণের দিকে একখানা ঘর পরিষ্কার করে ইন্দ্রজিতের আস্তানা হয়েছে। আড়াই টাকা দামের তক্তপোষ, প্যাকিংবাক্সে কিছু বই, টিনের একটা সুটকেসে কিছু জামা কাপড়। সম্বল এই। ঘরভাড়া আট টাকা।

দেশে গিয়ে এবারে ভারি রোগা হয়ে এসেছে ইন্দ্রজিৎ, খুব নাকি অসুখ হয়েছিল। বললে, 'আর মেসের বেলতলায় যাচ্ছি না।'

নীলা অবাক হল একদিন সকালে শান্তিকে সিঁড়ির কোণের খালি জায়গাটুকু পরিষ্কার করতে দেখে।

'কী ব্যাপার শান্তিদি।'

'রান্নার জোগাড় করছি, ভাই।'

'সে কি। তোমাদের খাবার তো হোটেল থেকে আসে শুনি।'

'আসত। কিন্তু লক্ষ্মীছাড়া কবিটা আবার এসে জুটেছে দেখছ না। ওকে কী দিই।'

'ইন্দ্রজিৎবাবুও তোমাদের সঙ্গে খাবেন বুঝি?'

'ওমা, খাবে না। চারটি ঘরের রান্না খাবে বলেই না মেস ছেড়ে এখানে এসে উঠেছে।'

দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালে নীলা। মাথা নিচু করে শান্তি উনুনে ফুঁ দিচ্ছিল বলে দেখতে পেল না। নীলা বললে, 'কিন্তু তোমার না রান্না করা

কারণ শান্তিদি হার্ট ডিজিজ, ডাক্তারের মানা ?'

মাথা তুলে তাকাল শান্তি। উনুনের ধোঁয়ায় না মনের আবেগে চোখ দু'টো চকচক করছে। বললে, 'আগে পেট ভরলে তবে তো লোকে হার্টের কথা ভাবে ভাই ? ইন্দ্রজিৎ মাসে মাসে ত্রিশ টাকা করে খরচ দেবে, সব অনিশ্চয়তার মধ্যে ওইটুকুই তো নিশ্চিত।'

নীলা ভাবলে জিজ্ঞাসা করে অভাব কি এতই বেড়েছে শান্তির যে জুয়া খেলেও আর কুলোয় না, তাই হারবার জন্যে যে তৈরী, সেই মানুষটাকে শুদ্ধ টেনে আনতে হয়েছে ?

মণীন্দ্রকে আজকাল বেশি দেখতে পাওয়া যায় না। চায়ের সময় না, নাওয়ার সময় না, খাওয়ার সময় না।' জিজ্ঞাসা করলে শান্তি বলে 'ফেরেনি', কিম্বা 'বেরিয়ে গেছে'।

কোথায় ঘুরছেন এত মণিদা। আবার কোথায় থিয়েটারে। নাটক নিয়ে ঘোরাঘুরি করছেন।

'নাটক লিখছেন বুঝি মণিদা ?'

'নতুন নয়, পুরোনো উপন্যাসগুলোকেই এখন নাটক করছেন।'

'উপন্যাসকে নাটক করছেন ? কেন ?'

'বোঝ না ? নাটকে পয়সা যে ঢের বেশি। একটা নাটক চলতে শুরু করলেই—'

হু-হু করে যে টাকা আসতে থাকবে সে-কথাটা অসম্পূর্ণ রেখেই শান্তি থেমে যায়। বলে, 'যাই, ভাই। কবিকে চান করার তাড়া দিইগে।'

থিয়েটারে দিনকতক ঘোরাঘুরি করেই মণীন্দ্র বুঝে নিয়েছে এ-বড়ো শক্ত ঠাঁই। গল্প চাই মন ভুলানো, দৃশ্য চাই চোখ ভুলানো। তাছাড়া চমকপ্রদ সিচুয়েশন চাই, প্রতি অঙ্কের শেষে করতালি। অভিনেতার উপযোগী চরিত্র চাই।

পাগলের মতো ঘোরাঘুরি করছে মণীন্দ্র। ফরমাস মাফিক প্রতিবার লেখা বদলে, ঘষে মেজে নতুন করে নিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবার ফেরৎ পাচ্ছে খাতা। কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই, সারা দুপুর ঘোরাঘুরির পর টকটকে মুখ করে বাড়ি ফেরে, আবার বেলা না পড়তেই বেরুতে হয়।

থিয়েটারের মালিকের বাড়ি গিয়ে হয়ত শোনে, মালিক গেছেন থিয়েটারে। ছুটল সেখানে। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর হয়ত সাজঘরে ঢোকার ছাড়পত্র পেল।

পাত্রমিত্র নিয়ে সভা জাঁকিয়ে বসে আছেন। আড়চোখে মণীন্দ্রকে দেখে নিয়ে বলেন: 'আসুন মণীন্দ্রবাবু। দেখি আপনার খাতা। শুধরে এনেছেন ?'

'এনেছি।' মণীন্দ্র বললে। স্নায়ু শুধু হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়াই দ্রুততর করে না, গলাও কাঁপায়।

'পড়ুন শুনি।'

একটু পড়ে, বাধা পায়, আবার পড়ে, কেটে শোধরাতে হয়। একটা দৃশ্যের শেষ কথাটা শুনে প্রধানা অ্যাকট্রেস চামেলি হেসেই অস্থির। 'থামুন আপনি মণীন্দ্রবাবু। এতখানি কথাও আপনার কলমে যোগায়। পেটে খিল ধরে মরে যাব যে।'

অল্প অল্প ফোটে মণীন্দ্রের মুখ। আমতা আমতা করে বলে, 'এ-সিনটা রিলিফের জন্য দিয়েছি। এর পরে আছে একটা মৃত্যুর দৃশ্য।' আসলে হাসির দৃশ্যটা ওর নিজেরও মনঃপূত ছিল না। থিয়েটারের পোষা ভাঁড় অমৃত নন্দীর জন্যে মালিকের কথামতো ওটা জুড়ে দিতে হয়েছিল।

মৃত্যুর দৃশ্যটা আর শুনল না চামেলি। কাজ আছে অজুহাতে সরে পড়ল। মাথার চুলটা ঠিক করতে করতে ডিরেক্টারের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে বলল, 'আপনার গাড়িটা তো নিচেই আছে, না সুহাসবাবু?'

সুহাসও পেছন পেছন বেরিয়ে গেল।

আজ থিয়েটার ছুটি।

সবাই চলে যেতে মালিক বললেন, 'আপনার বইটা চামেলির মোটে পছন্দ নয় সান্যাল মশায়।'

'কেন? স্টোরীটা তো খুব—'

'স্টোরীর জন্যে কি আটকাচ্ছে মশাই। ওই মৃত্যু দৃশ্যটাও বাদ দিতে হবে। সীনটা অবশ্য জমজমাট, কিন্তু কী করা যাবে? ওই সীনে যদি ওর স্বামী মারা যায়, তবে মেয়েটিকে বিধবা হতে হয় না?'

'হলই বা।'

'মনুষ্যচরিত্রের এইটুকু অভিজ্ঞতা নিয়ে আপনি নাটক লেখেন? আরে মশায়, বিধবা হলে থান কাপড় পরতে হয় যে। প্রথম অঙ্কে নায়িকা যদি বিধবা হয়, তবে চামেলিকে গোটা বইটাতেই সাদা পোষাক পরে প্লে করতে হয়।' শটকায় মৃদু টান দিতে দিতে চোখ বুজে নৃপনাথবাবু বললেন, 'চামেলি তাতে কিছুতেই রাজী হবে না।'

মণীন্দ্রের মুখ শুকিয়ে গেল।

'তবে?'

সমস্ত ধোঁয়া নাক আর মুখে সমান ভাগে ভাগ করে দিতে দিতে নৃপনাথ বাবু চোখ খুললেন। 'উপায় আমি স্থির করেছি। আপনাকে আর কষ্ট করতে হবে না। খাতাটা আমার কাছে রেখে যান। যা দরকার হয় আমিই করব।'

'আপনি করবেন?'

নৃপনাথবাবু হাসলেন না। হাসির মতো মুখভঙ্গি করলেন মাত্র। 'কেন আমি লিখতে জানি না ভেবেছেন। আরে মশায় পঞ্চান্ন বছর বয়স হল, কমসে কম একশো নাটক আমার হাত দিয়ে বেরিয়ে গেছে। জেনে রাখুন সে সব নাটকের দশআনা বারো আনা আমারই লেখা। মশায়, আপনারা তো লিখে

নিৰ্ঝঞ্ঝাট ; আর্ট হল কি না দেখেই খুশি। আমাকে দেখতে হয় আরো বড়ো ব্যাপার। আমার অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মানাবে কিনা। লোকে নেবে কিনা। আরো সোজা ভাষায়, টাকা।'

আরো একবার বুক অবধি ধোঁয়ায় ভরে নিলেন নৃপনাথবাবু। আরো একবার ছেড়ে বললেন, 'আপনার নাটকটা রেখে যান। কিছু ভাববেন না। ধরুন, স্বামীটাকে মেরে না ফেলে নিরুদ্দেশেও পাঠানো যায়। যায় তো ?'

'যায়।' মণীন্দ্র নির্জীব গলায় বললে।

'ব্যস, তা হলেই গোলমাল চুকে গেল। বারো বছরের মতো চামেলিকে আর থান কাপড় পরতে হচ্ছে না। অথচ স্বামী হারানোর এফেক্টটুকু আপনি পাচ্ছেন। মশায়, শুধু ফরমুলা নাটক লেখা ফরমুলা ছাড়া কিছু না। এ আর বি একত্র করে হোল-স্কোয়ার করে দিন। তারপর আপনা থেকেই হয়ে যাবে আরো একটু ত্রুটি আছে নায়িকার বয়স ছাব্বিশ করেছেন। ওটাকে আঠারো-উনিশ করতে হবে।'

'কেন ?'

'ছাব্বিশ বছর বয়সের মেয়ের পার্ট চামেলি নেবে কেন।'

আমতা আমতা করে মণীন্দ্র বলল, 'ওর বয়স যে শুনেছি—'

'ছত্রিশ।' নির্বিকার গলায় নৃপনাথবাবু বললেন, 'ওকে আমিই ডিস-কভার করেছিলুম। ওর বয়স তখন সতেরো, আমার ছত্রিশ।' বলতে বলতে নৃপনাথবাবুর গলা উদাস হয়ে গেল, 'সেসব যাক। চামেলির বয়স ছত্রিশ, কিন্তু কুড়ি বছরের বেশি কোন মেয়ের পার্টে ও আজ পর্যন্ত নামেনি। চল্লিশ পুরো না হলে এ লাইনে কেউ একটা বড়ো মাসি-পিসির পার্ট নিতে চায় না।'

স্তম্ভিত মণীন্দ্রের দিকে তাকিয়ে নৃপনাথ বললেন, 'আপনাকে আর কিছু ভাবতে হবে না তো। জেনে রাখুন আপনার নাটক মনোনীত হয়ে গেছে।'

'আমার নাটক!' এমন ক্ষীণ হয়ে কথা ক'টি বেরুল যে, মণীন্দ্রের মনে হল অন্য কারুর কণ্ঠস্বর শুনল।

'হ্যাঁ, আপনার নাটক।' নৃপনাথ প্রসন্ন হাস্যে বললেন, 'নাটক তো আপনারই। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার পড়বে দেখবেন। কাগজে কাগজে সমালোচনা হবে। পুরো মহলার দিন কিছু টাকাও নিয়ে যাবেন।'

সেদিন রেস্তোরাঁয় চায়ের পেয়ালা ঠাণ্ডা করে মণীন্দ্র অনেকক্ষণ ধরে ভাবলে, সে খুশি হবে কিনা। দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার। কাগজের স্তম্ভে স্তম্ভে উচ্ছ্বাস। মহলার দিনে টাকা। তার নাটক। তারই তো। আর্ট ? ঠাণ্ডা চায়ের সঙ্গে একটা দেয়ালি পোকা মুখে উঠে এসেছিল, থুঃ করে মেজেয় ফেলে দিয়ে মণীন্দ্র ভাবল, ও-কথা যত কম ভাবা যায় ততই ভালো। অতই যদি আর্টের মায়া তবে ছাতে বসে বাঁশী বাজালেই পারত, কিম্বা রুদ্ধ ঘরে

বেহালা ? এ-পথে নেমে এল কেন। উপন্যাসকে নাটক করতে যদি না বেধে থাকে তবে সামান্য অদলবদলেই বা আপত্তি কী ?

শুনে শান্তি একেবারে কাছে সরে এল। ওর বালিশ ছেড়ে মণীন্দ্রের সঙ্গে একই বালিশে মাথা রেখে বলল, 'সত্যি ? তোমার নাটক স্টেজ হবে ? সত্যি বলছ ?'

'আমার নাটক।' অন্ধকারে মণীন্দ্রের গলা শোনা গেল শুধু, 'কে জানে আমার কিনা। তবে লোকে জানবে আমার, বলবে আমার। বলতে বলতে যেন ঈষৎ উত্তেজিত হল মণীন্দ্র, শান্তির চিবুক কঠিন হাতে তুলে ধরল ; শিরা-ওঠা আঙুলগুলো দপ দপ করছে। চোখে চোখ রেখে বলল, 'কল্পনা করো শান্তি তুমি মা হয়েছ, কিন্তু সেই সন্তান আমার নয়। তোমার কোলে ফুট-ফুটে ছেলে সবাই প্রশংসা করছে। কেউ তার চুল, কেউ তার নাক আমার সঙ্গে তুলনা করে বলছে, "ঠিক ওর বাবার মতো হয়েছে"—আমি স্মিত, অপ্রতিভ লজ্জিত মুখে সব শুনছি, মেনে নিচ্ছি বিনাবাক্যে। আমার তখনকার চেহারাটা কল্পনা করতে পারো—'

অকস্মাৎ মণীন্দ্র চুপ করে গেল। শান্তি একখানা হাত ওর মুখে চাপা দিয়েছে।

গীতা আর অণিমা এসে গেছে এ-বাড়িতে, ললিতা আর স্টেলা আসবে ও-মাসে। নীলা বেড়াতে এসেছিল।

বাড়িতে শুধুমাত্র একটা নরুনপেড়ে ধুতি পরে আছে শকুন্তলা। আর টিলে একটা সেমিজ। বললে, 'সব তো বেশ গুছিয়ে নিয়েছি। চাকরিও ছাড়লাম নার্সিং হোমের ভরসায়। অফিস করেছি অথচ একটা টেবিল নেই, দিন না আপনি কিছু চাঁদা তুলে। দেবেন ?'

'আমাকে কে চাঁদা দেবে।'

শকুন্তলা মুখ টিপে হাসল। 'দেবে দেবে। সবাই দেবে। ওই তো কবি ইন্দ্রজিৎ রয়েছে, আপনাদের বাসায়। ওর কাছে চেয়ে দেখুন না।'

'ক্ষেপেছেন! ও টাকা পাবে কোথায়। চাইলে বলবে আমি কবি মানুষ, গোঠে মাঠে ধাই, ধবলীর চরাই, টাকার কথা কী-ই বা জানি। ওর আশা ছাড়ুন।'

'উঁহু।' শকুন্তলা বললে, 'আমরা অত সহজে আশা ছাড়ি না। বেশ তো আপনি না পারেন, আপনার শান্তিদিকে দিয়ে বলিয়ে দেখুন না। আমার তো মনে হয়, আপনার শান্তিদি ঠিক পারবেন।'

শান্তিদি পারবে। নীলা নয়। কে জানে কী ইঙ্গিত ছিল শকুন্তলার কথায়, নীলার ভেতরটা জ্বালা করে উঠল, কোথায় যেন পরিহাস প্রচ্ছন্ন আছে কথাটায়, প্রায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্ররোচনা দেয়।

কেমন অস্বস্তি বোধ হল নীলার, হঠাৎ জোর গলায় বলে উঠল, 'আমিও পারব। ইন্দ্রজিৎ বাবুর কাছ থেকে সেবাসত্রের জন্য চাঁদা আদায় করে ছাড়ব।'

'করুন তাহলে।' আলগা খোঁপার চুলের স্তূপ তুলে ঘাড়ের কাছের ঘামাচি মারতে মারতে শকুন্তলা বললে।

দুবার ইন্দ্রজিতের দরজায় টোকা দিয়েছিল নীলা। তারপর অল্প একটু ঠেলে পা টিপে টিপে ভেতরে চলে গিয়েছিল। স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে যেত কিনা সন্দেহ। কিন্তু শকুন্তলার ঠাট্টাটা তখনো বাজছে কানে। কিন্তু দু'পা এগিয়েই আবার পিছিয়ে আসতে হল। আবার দরজাটা টেনে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াল নীলা। চোখ দুটি ঢেকে ফেলেছে, কপালের সমস্ত রক্ত শুকিয়ে গিয়ে বুঝি জমা হয়েছে স্তব্ধস্পন্দ হৃদপিণ্ডে!

আবার এক পা দু'পা করে এগিয়েছিল সিঁড়ির দিকে। হঠাৎ কে এসে পেছন থেকে ফিরে টানল। তাকিয়ে দেখল শান্তি। বুঝি ওরই পেছন পেছন বেরিয়ে এসেছে। সিঁড়ির নিচে দু'জনে মুখোমুখি হল। বার কয়েক পলক পড়ল নীলার। পল্লব দু'টি ভিজে উঠেছে। শান্তি তখন থেকে একবারও চোখের পাতা না ফেলে চেয়ে আছে। অন্ধকারে মাকড়সার জাল বিছানো কোণটিতে দাঁড়িয়ে সেই নির্লজ্জ, নির্মম, স্থিরপাথর চাউনির সামনে নীলার সমস্ত শরীরটা থর থর করে কেঁপে উঠল। আর্তবিবর্ণ, দুঃস্বপ্ন-দেখা গলায় চেঁচিয়ে বলে উঠল, 'শান্তিদি, তুমি এমন!' আর কী আশ্চর্য, যাকে ভয়, যাকে ঘৃণা, সেই শান্তিকেই প্রাণপণে জড়িয়ে ধরল নীলা।

শান্তি বুঝি ওকে আস্তে আস্তে ঠেলে দিলে, কিন্তু নীলার একখানা হাত রইল ওর মুঠিতে। কঠিন গলায় শান্তি বলল, 'নীলা শোন। এখানে এই বাইরে দাঁড়িয়ে কোন কথা হয় না। ঘরে এসো।'

ঘরের ভিতরে নীলাকে তক্তপোষের ওপরে বসিয়ে শান্তি প্রতিটি কথা শান্ত অথচ দৃঢ় ভঙ্গীতে উচ্চারণ করে বললে, 'তুমি কতটুকু দেখেছ জিজ্ঞাসা করব না। অনুমান করছি সবই দেখেছ। তুমি এই সন্ধ্যাবেলা ওর ঘরে কেন ঢুকেছিলে, তা নিয়েও আমার কোন প্রশ্ন নেই, যদিও কৌতুকবোধ এবং সামান্য একটু মেয়েলি কৌতূহল আছে।'

একটু দম নিয়ে শান্তি বলল, 'ভালোই হল, আজ তুমি সব জানলে। আমিই কিছুদিন থেকে তোমাকে সব খোলাখুলি বলব' ভেবেছিলাম। কিন্তু হাজার হলেও ভদ্রমহিলা তো, শেষ সঙ্কোচটুকু জয় করতে পারিনি। সাবধান করে দেব ভেবেও দিতে পারিনি! আজ এ ভালোই হল নীলা। বেশী দূরে এগোবার আগেই তুমি জানতে পারলে এ-পথে সর্বনাশ আছে। আমার চেয়ে তোমার ভাগ্য ভালো।'

'কিন্তু শান্তিদি', নীলা এতক্ষণে কথা বলতে পারল, 'মণিদা জানেন?'

'কে মণিদা ও, আমাদের কথাশিল্পী—নাট্যকারের কথা বলছ?' তিক্ত বিদ্রূপে শান্তির ঠোঁট দু'টি সামান্য বেঁকে গেল। 'কী জানি ভাই; তবে ওঁকে জানানোর জন্যেই তো আমার এই জাল ফেলা।'

'ওঁকে জানানোর জন্যে?'

'হ্যাঁ ভাই। এই আত্মরতিরত আর্টিস্টের আত্মপ্রতারণা আমি ঘোচাতে চাই। এই সব আর্টিস্টদের তুমি চেনোনা নীলা। এরা প্রত্যেকের সঙ্গে ছলনা করে, করেই চলে, শেষ পর্যন্ত নিজেদের সঙ্গেও। এদের বইয়ের পাতায় পাতায় দুর্দশা, অভাব, দৈন্যের জয়ধ্বনি। সব হারানোর মধ্যেই সব পাওয়া নিহিত, এমনি একটা নীতিবাক্য। অথচ নিজেদের জীবনে এরা আবার কামনা করে স্বাচ্ছল্য। আঃ, এদের সেই হ্যাংলামির রূপ তুমি যদি দেখতে। রূপ, জয়, যশ—শুধু দেহি দেহি রব ওদের। এদের বইয়ের পাতায় পাতায় পতিতারা মহিয়সী, সতীত্ব শুধুমাত্র কুসংস্কার। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে এরাই আবার কী সন্দিগ্ধ ; আপন স্ত্রীদের কাছ থেকে চড়া হারে একনিষ্ঠ সতীত্বের শুল্ক আদায়ের আশা করে। এই ভণ্ডামি শিল্পীজীবনের সঙ্গে ব্যক্তিজীবনের পর্দা-টাঙানো সদর-অন্দর আমি ঘুচিয়ে দেব।'

'নিজের সম্মান বাঁধা রেখে, শান্তিদি ?'

'সম্মান বাঁধা রেখে ? সম্মানের আর কতটুকুই বা আছে ভাই ? ক্লান্ত গলায় শান্তি বললে, 'কতটুকু নিয়েই বা জন্মেছিলাম, অর্জনই বা করেছি কতটুকু। কেবলই তো খুইয়েছি। বিয়ে হল, কিছু পেলাম না নীলা। না নিশ্চিন্ত জীবন, না নিশ্চিন্ত ঘর। আরো কিছু বরং গেল। উদাসীন স্বামী, নিজের গড়া এক বিকৃত বিকালঙ্গ শিল্পের মোহাচ্ছন্ন টাকা নেই, হাঁড়ি চড়ে না। সে ভাবনা, সব দায়িত্ব যেন আমর। সারা জীবন ধরে ঠিক করেছি, কিছু না পাওয়ার শোক ভুলে যাব। জীবনের আর কোন সাধ নেই, আর কোন সুখ নেই। নইলে বেঁচে থাকার জন্যে,—শুধই বেঁচে থাকার জন্যে যাকে ভালবাসার অভিনয় করতে হয়, সে বেঁচে থাকাকে ভালবাসব কী করে বলতে পারো ?'

'শুধুই অভিনয় ?'

'অভিনয়, অভিনয়, অভিনয়। নইলে', শান্তি এতক্ষণ কঠিন হয়ে কথা বলছিল, হঠাৎ যেন স্বচ্ছন্দ হয়ে বসে পড়ল নীলার পাশে, নইলে তুমি কি মনে করো ওই অপদার্থ ছড়া-মেলানো ছোঁড়াকে আমি—

হাত বাড়িয়ে একটা বালিশ কোলের কাছে টেনে নিয়েছিল শান্তি ; সেটাতে মুখ গুঁজে যেন হাসির তোড় সামলে নিলে।

৯

সব দেখে শুনে অবিনাশ বললেন, 'আমি দেব টেলিফোন।'

পকেট থেকে চেক বই বার করে বললেন, 'কত টাকা চাই ?'

শকুন্তলা ওঁর চেয়ারের হাতলের ওপর একটা হাত রেখে দাঁড়িয়েছিল। কুণ্ঠিত স্বরে বলল, 'এটা কিন্তু আপনি বড্ডো বাড়াবাড়ি করছেন। আমরা কে কী রকম লোক না জেনেই এত টাকা—'

'কিছু দরকার নেই, কিছু দরকার নেই।' অবিনাশ বললেন, 'নীলার

কাছে আমি সব শুনেছি। এসব কাজে আমার খুব উৎসাহ আছে। পাঁচটা নারীকল্যাণ আশ্রমে মাসে পঞ্চাশ টাকা করে আমি চাঁদা দিই, জানেন। আর এ তো হ'ল সেবা। আরো উঁচু, আরো মহৎ। শুধু নারীর কল্যাণ নয়, সকলের সেবা।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ', শকুন্তলা হাল্কা গলায় বললে, 'সকলের, ছেলেমেয়ে শিশু সকলের শুশ্রূষার জন্যেই আমরা তৈরি আছি। বুড়ো—এমনকি, আপনার মত বুড়োদের জন্যেও।'

বুড়ো? হঠাৎ-বুক থেকে কাশির একটা ডেলা উঠে এল অবিনাশের গলায়। সামলে নিয়ে বললেন, 'ঠিক বলেছেন, বুড়ো।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে যোগ করলেন, 'বুড়োদের কথা কেউ ভাবে না মিস সরকার। চেকটা তাহলে—'

'নীলার হাতে দিয়ে দেবেন।'

'সেই ভালো, সেই ভালো', অবিনাশ উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আজ আমি চলি তবে।'

'ভালো করে ঢেকে ঢুকে যান। আজ বাইরে বড়ো ঠাণ্ডা।'

উপদেশটা ভালো ঠেকল না অবিনাশের, তবু গলাটা কম্ফর্টারে ঢেকে নিতে ভুললেন না। এই সব অল্পবয়সী মেয়েগুলো কী যে ভাবে তাঁদের। গলাবন্ধ জামার বোতাম লাগাতে লাগাতে অবিনাশ আড়চোখে লক্ষ্য করলেন, নিজেরা কিন্তু বেপরোয়া। এই অঘ্রাণের শীতেও সব হাতকাটা ব্লাউস পরে আছে, আধখানা কাঁধে আঁচল, আধখানা খালি। পায়ে চটি। যত হুঁসিয়ারী সব কি শুধু অবিনাশের বেলায়?

রাস্তায় এসেও অবিনাশ আফশোষটা ভুলতে পারছিলেন না। আফশোষের সঙ্গে অতি সূক্ষ্মভাবে মেশানো আছে উত্তেজিত অনুভূতি। চেয়ারের হাতলের ওপর হাত রেখে দাঁড়িয়ে ছিল শকুন্তলা, আর এ সব মেয়েদের অবস্থা যেমন হয়, প্রায়ই আঁচল খসে খসে পড়ছিল, পরক্ষণেই নুয়ে পড়ে কুড়িয়ে নিচ্ছিল। দুএকবার ঘাড় ফিরিয়ে কথা বলতে গিয়ে শকুন্তলার দুএকটা অবিন্যস্ত চুল অবিনাশের সাদার ইশারা দেওয়া সদ্য-কামানো গালে এসে পড়েছিল। টিকিতে ইলেকট্রিসিটি, কিন্তু চূর্ণকুন্তলেই বা কম কী বাবা? ছুঁড়ি আবার বলে, আমাদের চেনেন না, জানেন না, এতগুলো টাকা হঠাৎ দিয়ে বসলেন? আরে, না-চেনা, না-জানা জায়গায় অবিনাশ জীবনে এই প্রথম টাকা ঢালছে নাকি। বিজনেসে রিস্ক আছেই। প্রতি শনিবার যত ঘোড়ার ওপর তিনি বাজি রাখছেন, তার সব কটাই কিছু নৈকষ্য কুলীন নয়। তবু অদৃষ্টে থাকে যদি, ওরাই টাকা দেয়।

এও একটা নেশার মতো দাঁড়িয়ে গেছে অবিনাশের। যত্রতত্র টাকা শুধু ছড়িয়ে যাও। একা মানুষ এত টাকার প্রয়োজন কী, যেটুকু ছড়াচ্ছেন, তত আসল নয়, জুলপি বেয়ে তেল গড়াচ্ছে।

ছ' এর এফ বাড়িটার সম্মুখে অবিনাশ দাঁড়ালেন। ছড়ি দিয়ে রকটাকে ঠাহর করে নিলেন। এ বাড়িতেও একবার যেতে হবে। কী একটা সর্বনাশা

ঝোঁক ভূতের মতো ঘাড়ে চেপে বসেছে অবিনাশের। চরকির মত ঘুরপাক খেতে হচ্ছে।

শরীর মরেছে, মন মরেনি—এ বড়ো মর্মান্তিক ট্র্যাজেডি। মৃতদেহে একটা সজীব, সবুজ ক্ষুধাতুর মন বহন করছেন অবিনাশ। নইলে কী দরকার ছিল নীলার মুখে একটুখানি শুনে কি না শুনেই আজ সন্ধ্যাবেলায় এ-বাসায় লুকিয়ে ছুটে যাবার। লুকিয়ে, এমনকি, নীলাকেও লুকিয়ে।

ইন্দ্রজিৎ কতই বা দিত, অবিনাশ দিলেন তার চতুর্গুণ। চেকটা পেয়ে নীলা খুশি। শকুন্তলার কাছে মুখরক্ষা হল তবু। কিন্তু মুখরক্ষা হলেই মনের সঙ্গে বোঝাপড়া ফুরোয় না। ইন্দ্রজিতের কাছে পরাজয়ের গ্লানি কি ঘোচে অবিনাশের কাছে বিজয়ে? কী জানি।

কিন্তু অত জানাজানির দরকারই বা কী? হাতে হাতে যা পাওয়া যায়, তার দামও ঢের। নীলা সেদিন অবিনাশকে উপরি দুখানা গান শুনিয়ে দিল। কালই শকুন্তলাকে চেকটা দিয়ে আসতে হবে।

আর, রাস্তায় নেমে অবিনাশ কম্ফর্টারটা খুলে ফেললেন। আজ যত খুশি ঠাণ্ডা লাগাবেন তিনি। কপালের শিরগুলো দপদপ করছে, ঘাড়ের কাছে, কানের গোড়ায় একটু হিমেল হাওয়ার ছিটে লাগুক।

কাল না হয় চ্যবনপ্রাশের মাত্রাটা বাড়িয়ে দেওয়া যাবে। আর পুরোনো ঘি। একটু বেশি সময় নিয়ে মালিশ করতে হবে।

প্রমথর দোকানের সামনে দিয়ে যাবার সময় অবিনাশ একবার থমকে দাঁড়ালেন। গরাদের ভেতর থেকে কে যেন কৌতূহলী চার-চোখে ওঁকে লক্ষ্য করছে। এক মিনিট দাঁড়িয়ে সাইনবোর্ডটা পড়লেন। কী ভেবে ঢুকলেন ভেতরে।

প্রমথ উঠে দাঁড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। 'আসুন স্যার। কী চাই।'

কী চাই?—এদিক-ওদিক ভালো করে তাকালেন অবিনাশ। দোকানের যা চেহারা, বেশি কিছু চেয়ে পাওয়া যাবে বলে মনে তো হয় না। তাড়াতাড়িতে এ-দোকানে ঢুকে পড়াই ভুল হয়েছে। ওঁর বাঁধা স্যাকরা ছিল, তার কাছে গেলেই চলত।

শুঁড়ি দোকানে ঢুকে অনভিজ্ঞ নবাগত যেমন লজ্জিত চাপা গলায় প্রার্থিত পানীয়দের ফরমাস দেয়, তেমনিভাবে অবিনাশ বললেন, "প্রেজেণ্ট দেবার মতো কিছু আছে?'

'আছে স্যার! কী চাই বলুন। আংটি?—দুল?'

দুল নিলে ব্যাপারটা বড়ো খোলাখুলি হয়ে পড়ে। অবিনাশ এ-পাড়ার স্যাকরাকে অতটা জানতে দিতে রাজি নন।

বললেন, 'আংটিই ভালো।'

অদৃশ্য একটু হাসি খেলে গেল প্রমথর মুখে। বাক্স খুলল। 'সাইজ? এই সাইজে চলবে?'

সাইজের কথা অবিনাশ ভাবেন নি। চাঁপার মতো একটি আঙুলকে সোনার বেড়ি পরাবেন কল্পনা করেই উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছিলেন, একটা বেছে নিয়ে বললেন, 'এইটে বোধ হয়।'

দর নিয়ে অবিনাশ কখনো কষাকষি করেন না। নীল কাগজে মোড়া আংটিটা টুপ করে ফেলে দিলেন পকেটে। একটা বড়ো রকমের রিসক্‌ নিতে যাচ্ছেন। কিন্তু এসব কাজে সাহস একটু চাই বৈকি। সিনেমা দেখেছ। গান শুনিয়েছ। আং—আং—আংটি নেবে না?

দরজা আবার ভেজিয়ে দিয়ে ভেতরে এসে বসল প্রমথ। আংটি কেউ কিনবে বলেই না আরেকজন আংটিটা সেদিন এসে বেচে দিয়েছিল। কেনা-বেচা, বাঁচামরা। সংসার-তটিনীর দুই তীর। কথক ঠাকুরের কাছে গিয়ে তত্ত্বকথাটা ভালো করে বুঝে আসতে হবে।

এই গরাদের ফাঁকা দিয়ে তাকালে দেখা যায়, জানালায় জানালায় রঙ-বেরঙের শাড়ি ঝুলছে।

কিন্তু গোয়ালার গলির শুকনো চোয়ালে আবার একটু একটু করে প্রাণের ছোপ লাগছে যেন। কিন্তু প্রাণ তো শুধু রঙে নয়, শব্দেও। সন্ধ্যাবেলা সামান্য একটু সিদ্ধি চড়িয়েছিল প্রমথ। তাতে নেশা হয় না, কিন্তু বাঁয়া-তবলার তালে তালে, পায়ে পায়ে নূপুরের শিঞ্জিনী শোনা যায়। বসাক-বাবুদের আমলে ফরাস পড়ত, তাকিয়া, গড়াত ছিপি-খোলা সোডার বোতলের শব্দের মতো বুঁদগলায় তারিফ বন্ধুদের মতো হাওয়ায় ভাসত।

আবার সেই দিন আসছে। তার স্পষ্ট পদধ্বনি শুনতে পেয়েছে প্রমথ।

তিক্ততম বিতৃষ্ণার অববাহিকার তীব্রতম তৃষ্ণার প্রবাহ আবিষ্কার করে নীলার বিস্ময় লাগল। নইলে সেদিন ইন্দ্রজিতের ঘরে যা দেখে পিছিয়ে এসেছিল, তারপরে সমস্ত চিত্ত বিমুখ হয়ে যাবার কথা। কিন্তু ঘৃণাও যে ঘৃতস্নিগ্ধ অনুকম্পন জড়ানো, একটা ঊর্ধ্বমুখী সলতের মতো কাঁপে, পুড়ে পুড়ে ছাই হতে চায়।

রাগ হবে কি। যাই দেখে থাকুক সেদিন, চোখের সাক্ষীর চেয়েও বড়ো একটা জিনিস আছে; মনের সায়। সেই মন যদি বলে ইন্দ্রজিতের কোন দোষ নেই, ইন্দ্রজিৎ শান্তির নিষ্ঠুর একটা খেলার উপকরণ মাত্র, তবে নীলা করবে কী।

একতলার ঘর অন্ধকার। পা ফেললে হিম হয়ে যায়, পাতা অবধি ভিজে যায়। ফাটা মেজের ভেতর থেকে মৃত্তিকার অদৃশ্য অসংখ্য হাত অসুস্থ সিক্ত স্নেহে জড়িয়ে ধরে। প্রাণিতত্ত্বে অনুল্লিখিত কোন সরীসৃপের লালাসিক্ত রসনার লেহন।

দরজা ঠেলতেই অল্প একটু শব্দ হয়েছিল। ইন্দ্রজিৎ চোখ মেলে তাকাল: 'কে?'

নীলা জবাব দিল না। আরো এগিয়ে এসে খুলে দিল শিয়রের জানালা।

আরো এক ঝলক রোদ এসে পড়ল ঘরে। সে-রোদের রঙও নিস্তেজ, অস্বাভাবিক ; ক্ষয়িষ্ণু কলজে-ছেঁড়া কাশির সঙ্গে উঠে আসা খানিকটা রক্তের মতো।

ইন্দ্রজিৎ আবার জিজ্ঞাসা করলে, 'কে, শান্তি ?'

আপনা থেকে ঠোঁটের সঙ্গে দাঁত গেঁথে গেল নীলার।

'না আমি। শুনলাম আপনার অসুখ, তাই দেখতে এসেছি।'

'বেশ করেছেন। বসুন। কিন্তু জানালাটা খুলে দিলেন কেন।'

'বাঃ রে। একটু আলো আসবে না ঘরে।'

'না।' ফের চোখ বুজে ইন্দ্রজিৎ বললে, 'আমি অন্ধকারেই ভালো থাকি। অন্ধকারটাই আদিম, পৃথিবীর আসল রঙ, আলোটা কৃত্রিম প্রসাধন, ওপরের একটা আস্তর, সব জায়গায় পোঁছয় না।'

আজ অনেক সাহস করে এ-ঘরে এসেছে নীলা, মনের সঙ্গে অনেক বোঝা-পড়ার পর। ইন্দ্রজিতের এই প্রলাপের বিকার শোনাও এই প্রথম নয়। স্নিগ্ধ একটু হেসে বলল, 'তা হোক। আমরা মেয়ে তো। আমাদের একটু প্রসাধন লাগে।'

একটু ঘুরে গিয়ে শিয়রের কাছে দাঁড়াল নীলা। ইন্দ্রজিতের রোগশয্যার ওপর দিয়ে দীর্ঘ একটা ছায়া পড়ল। নিজের সেই ছায়া চিনতে পারল নীলা। রক্তমাংসহীন কমনীয় এক নারী—মূর্তি নয়, ভঙ্গিমাত্র। ইন্দ্রজিতের পা দুটি থেকে গলা অবধি ঢাকা আছে একটা অপরিচ্ছন্ন চাদরে। খোলা থাকলে বুঝি নীলার মাথার ছায়া ওর পায়ের ওপরই পড়ত।

ইন্দ্রজিতের মুখটা শুকনো কিন্তু চোখ দুটি টসটস করছে। চোয়ালের ভঙ্গিটি দৃঢ়তর ; ঈষদ্ভিন্ন দুটি ওষ্ঠাধরে অপ্রতিভ শিশুহাসি।

বুকের অন্তঃস্তল থেকে কাঁপা-কাঁপা একটা অনুভূতি নীলার সর্বাঙ্গে উদ্বেলিত হয়ে উঠল, তার নাম শুধু করুণা নয়, শুধুই করুণা নয়। ইন্দ্র-জিতের কপালে হাত রেখে বলল, 'ঈস, আপনার এত জ্বর !'

সেই হাতখানার ওপর ইন্দ্রজিৎ নিজের তপ্ত একটা হাত রেখে বলল 'কত জ্বর ?'

এক মুহূর্ত আত্মবিস্মৃত হয়েছিল, পর মুহূর্তে উঠে দাঁড়িয়ে নীলা বলল, 'অনেক। ওষুধ খাননি ?'

'খেয়েছি। কিন্তু আবার খাবারও বোধহয় সময় হয়ে এল।'

'কোথায় ওষুধ আছে বলে দিন।'

এদিক-ওদিক তাকিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলল, 'আপনি পারবেন না। শান্তি—শান্তি বৌদি জানে। সেই রেখেছে। তাকে ডেকে আনুন।'

দীপ্তিহীন একটা জ্বালা নীলার দু-চোখে জ্বলে উঠেই মিলিয়ে গেল। বলল, 'শান্তিদি ঘরে নেই তো।'

'নেই ? কোথায় গেল ?' অপ্রতিভ মুখে না-কামানো গালে হাত বুলিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলল, 'তবে থাক। আপনি আমায় এক গ্লাস জল দিন বরং।'

আজ যদি নিচে এসে নীলা শান্তিদির ঘরের সমুখে তালা ঝুলতে দেখতে না পেত, তবে এত সাহস ওর হত কিনা সন্দেহ। অবশ্য দেখতে যাওয়াও দুর্বলতা, একটু চোরের মতো সতর্কতা, তবু নীলা নিশ্চিন্ত হয়েই এ-ঘরে এসেছে।

জল নিয়ে এসে বলল, 'আর কি চাই বলুন।'

গ্লাসটা নিঃশেষ ক'রে দিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলল, 'আর কিছু না। ওই বাক্সটার ভেতর থেকে একটা বই বের ক'রে দিয়ে যান বরং। কবিতা পড়ে শোনাতে বলতাম ; কিন্তু আপনি তো কবিতা ভালবাসেন না।' এদিক ওদিক তাকিয়ে ফের বলল, 'কিন্তু ও ঘরের ওরা গেল কোথায়। আমাকে ওষুধ দেবে, বার্লি দেবে, বিছানার চাদরটা বদলে দেবে—'

'কোথায় চাদর আছে আর, বলুন। বদলে দিচ্ছি।'

আবার অসহায়, করুণ ভঙ্গিতে হাসল ইন্দ্রজিৎ। 'বলতে পারব না তো। শান্তি বৌদি জানেন।'

ঠোঁট কামড়াল নীলা! এ এক অসম প্রতিযোগিতায় নেমেছে। শকুন্তলা যদি সেই ঠাট্টাটা সেদিন না করত।

আস্তে আস্তে দরজাটা ভেজিয়ে ফিরে এল বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা ওর দৃঢ়তর হল মাত্র। ইন্দ্রজিৎকে বাঁচাতে হবে, শান্তির সর্বনাশা মোহের ঊর্ণাজালে বন্দী এই মক্ষিকাটিকে উদ্ধার করতে হবে।

'জানালা বন্ধ করে দিন। আলো চাই না।' ইন্দ্রজিতের রুগ্ন আর্তি তখনো কানে বাজছিল। মনে পড়ল শান্তির কথা। এ এক অদ্ভুত ধরনের আর্টিস্ট এরা। জীবনে দুঃখ, জীবনে শোক, জীবন ক্ষয়গ্রস্ত। নিজেরাও তাই ক্ষয়রোগে নিঃশেষ হবে বলে প্রতিজ্ঞা করেছে। নিচে নেমে, আরো নিচে শেষে গুহায় পালিয়ে ওপরের কঙ্করাস্তৃত ধরিত্রীর রূঢ় স্পর্শ থেকে বাঁচতে চায়। নিরলম্ব আকাশে, অথৈ পাতালে। সোজাসুজি দাঁড়িয়ে জীবনের মুখোমুখি হবে না। মাথা নত ক'রে পালানোর পথ খুঁজবে, তার অসুস্থ মনের বিকারে এমন একটা জগৎ রচনা করবে, যা অশরীরী ; রক্তমাংসঅস্থি সমন্বিত স্থূল রূপ নয়, একটা হলদে ইম্‌প্রেসনমাত্রকেই পরম সারবস্তু বলে জেনেছে। চোখ মেলে সাহস করে দেখবে না আরেকটা পৃথিবীর দিকে ; সে পৃথিবী শুধু রোদে পুড়ে পাথর হয় না, উজ্জ্বলও হয় ; ফুল ফোটে, ঘাম ছোটে, বরফ গলে সেই আলোয় প্রিয়সঙ্গমের সহনাতীত সুখে। সেই সুখকে জয় করার সাহস কই এদের। মাঝে মাঝে গুহা থেকে মুখ বাড়িয়ে দেয় বাইরে, আবার টেনে নেয় ভেতরে। এই জীবন, কিংবা জীবনের বিড়ম্বনা থেকে ইন্দ্রজিৎকে বাঁচাবে নীলা।

সন্ধ্যার পর গানের স্কুলে যাবার পথে দেখা হল শান্তির সঙ্গে। 'কখন ফিরলেন শান্তিদি ?'

'এই একটু আগে ভাই।'

'কোথায় গিয়েছিলেন ?'

'ওঁর থিয়েটারের রিহার্সেল। আজ ফুল রিহার্সেলে ছিল কি না, স্পেশাল নেমন্তন্ন ছিল।'

অনিচ্ছাতেও কণ্ঠস্বর কঠিন হয়ে গেল নীলার। 'আপনি থিয়েটারে গিয়েছিলেন, এদিকে বেচারা ইন্দ্রজিৎবাবু—'

'একা একা জ্বরে, তুলোওঠা তোষক থেকে ময়লা বিছানার চাদরটাকেই তুলে গায়ে দিয়ে ধুঁকছিলেন, এই কথা বলবে তো? কিন্তু দেখা-শোনার লোক তো রেখেই গিয়েছিলাম ভাই।'

'দেখা-শোনার লোক?' নীলা যেন বুঝতে না পারার ভাণ করল, 'সে আবার কে?'

জবাব না দিয়ে শান্তি একটা সেফটিপিন বাড়িয়ে দিয়ে নীলাকে বলল, 'এইটে ধরো! দেখে নাও, তোমার তো। ইন্দ্রজিতের বিছানার চাদর বদলাতে গিয়ে কুড়িয়ে পেয়েছি।'

শান্তির মুখের দিকে তাকানোর সাহস নীলার ছিল না। আড়ষ্ট ভাবেই হাতটা বাড়িয়ে দিল, যান্ত্রিক ভাবেই রেখে দিল চুড়ির সঙ্গে গেঁথে।

নীলার মিলিয়ে যাওয়া মূর্তির দিকে তাকিয়ে শান্তি আপন মনেই হাসল। বেশ লাগে এই কাঁচা মেয়েদের হঠাৎ রাঙিয়ে ওঠা এই হঠাৎ ধরা পড়ে যাবার লজ্জা। বয়স বেশ হয়েছে শান্তির, এ বয়সে প্রেমে বিশ্বাস নেই তার, কিন্তু প্রেম করায় আছে। এদের বয়স কম, তাই প্রেমে এখনো পড়ছে, দুটোকে এক ক'রে দেখছে।

১০

শান্তি কিন্তু পুরোপুরি নাটকটা না দেখেই চলে এসেছিল। না এসে উপায় ছিল না।

এমন একটা ব্যাপার ঘটবে, তা বুঝি সে জানত। আগেই টের পেয়েছিল। যেমন অমঙ্গল ঘটার আগে বাঁ চোখের পাতা নাচার মতো। হাত ফসকে আয়না পড়ে যাওয়ার মতো। স্ত্রী-সুলভ, কিংবা আরো সঠিক ক'রে বলতে গেলে, পশুসুলভ, সহজাত, কিন্তু নির্ভুল, অলৌকিক ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

নইলে সারাদিন যখন মণীন্দ্র পর্দার ওপাশে শুয়ে শুয়ে তার নাটক লিখেছে, অর্ধদগ্ধ বিড়ি সিগারেটের টুকরো মেজেয় স্তূপীকৃত হয়ে উঠেছে, তখন তো কই মনে হয়নি একবারো, যাই লোকটা কী লিখছে দেখে আসি। কিংবা মণীন্দ্রের অসাক্ষাতে একবারো খাতার পাতা উল্টে দেখার কৌতূহল হয়নি। এদিকে বসে বাঘবন্দী খেলেছে। আপন খেলাতেই মত্ত ছিল।

কিন্তু আজ বিকেলে ওর বন্ধু সদানন্দ যখন এসে নাটকের পুরো মহলা দেখতে যাবার কথা তুলল, তখন কী জানি কেন কৌতূহলটাই বড়ো হল। শুরু হবার আগে আলাপ হল নৃপনাথবাবুর সঙ্গে, থিয়েটারের মালিক। আরো দু'একজন। কেউ কেউ জিজ্ঞাসা করলে, নাটকটা তো আপনি আগেই

পড়েছেন, না? আমরা সেটাকে কেমন রূপ দিতে পেরেছি শুধু সেইটে দেখুন। শান্তি স্মিতমুখে বসে ছিল, কথা বলেনি।

তারপর শুরু হল। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ ঃ মণীন্দ্র পাশে। আরো ও-পাশে সদানন্দ। কাঠ হয়ে বসে শান্তি প্রথম অঙ্ক দেখল। আশ্চর্য, এ নাটক সে পড়েনি, এর ঘটনাবলী কিছুমাত্র জানা নেই তার, তবু সব চেনা মনে হয় কেন। যে মানুষগুলো সাজ-পোষাক পরে অঙ্গভঙ্গি করে মঞ্চের ওপর বক্তৃতা দিয়ে যাচ্ছে, তাদের এই যেন প্রথম দেখছে না শান্তি; প্রয়োজন হলে সে বুঝি এ নাটকের দু' একটা সংলাপ আগে থেকেই প্রম্‌ট্‌ ক'রে দিতে পারে।

প্রথম অঙ্কের শেষে মণীন্দ্র উঠে গেল। সাজঘরে তার ডাক পড়েছে। নাটক যত এগোয়, শান্তির অস্বস্তি তত বাড়ে। পাশের আসন খালি, তার ও-পাশে সদানন্দ,—মুগ্ধ চোখে অভিনয় দেখছে।

দ্বিতীয় অঙ্কের শেষেও মণীন্দ্র এলো না। অন্ধকারে চোখ দু'টো জ্বলে উঠেছিল শান্তির। আসবে না, জানত। সাহস নেই ওর শান্তির মুখোমুখি বসবার।

কিন্তু ততক্ষণে শান্তির কপালে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে। বার বার রুমালে মুখ মুছেও ঠেকানো যাচ্ছে না দেহ-মনের সেই স্বেদরোমাঞ্চ। এতক্ষণে বুঝতে পেরেছে শান্তি, কেন নাটকের পাত্রপাত্রীদের চেনা মনে হয়, আগে থেকে ঘটনাগুলোকে মনে হয় জানা।

চতুর্থ অঙ্কের শুরুতে আর পারল না। শান্তি অকস্মাৎ আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। সদানন্দের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমার বড্ড মাথা ঘুরছে, একটু বাসায় পেঁাছে দিয়ে আসবেন?'

সদানন্দ তন্ময় হয়ে দেখছিল। বিস্মিত হয়ে বলল, 'শেষ পর্যন্ত দেখবেন না?'

'মাথা যে আমার ভারি ঘুরছে সদানন্দবাবু। শেষ পর্যন্ত দেখতে গেলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাব।'

অত্যন্ত ঠাণ্ডা, নির্জীব কণ্ঠে কথাগুলো বলেছিল শান্তি, এতটুকু উত্তেজনা ছিল না। কিন্তু তবু সদানন্দের কানেও কেমন বিচিত্র, বেসুরো ঠেকেছিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকিয়েছিল শান্তির দিকে।

প্রায়ান্ধকার ঘর। কিছু বোঝা যায় না। তবু সদানন্দের মনে হয়েছিল শান্তির মুখখানা যেন একটাও-আঁচড়-না-পড়া পাথরের দেয়াল, তাতে ফোকরের মতো অন্ধকার দুটি চোখ, আর ছোট্ট একটুখানি হাঁপানো হাঁ।

'মণিকে ডাকি তবে?' সদানন্দ জিজ্ঞাসা করলে।

'কাজ কী ওঁকে বিরক্ত করে।' শান্ত হেসে শান্তি বলেছিল, 'নিশ্চয়ই ব্যস্ত আছেন। আপনি বরং আমাকে পেঁাছে দিয়ে ফিরে এসে বলবেন, আমি অসুস্থ হয়ে চলে গেছি।'

থিয়েটারের মহলা শেষ হয়েছিল ছ'টা কিম্বা সাড়ে ছ'টায়। কিন্তু মণীন্দ্রের সেদিন বাড়ি ফিরতে একটা বেজেছিল।

নিঃশব্দে দরজা ভেজিয়ে দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়তে যাচ্ছিল, শান্তি ততক্ষণ বিছানার ওপর উঠে বসেছে।

'তুমি ঘুমোওনি ?'

'না।' বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো শান্তি। বিস্রস্ত, অসম্বৃত ; উঠে গিয়ে দরজায় খিল দিয়ে এল।

'সদানন্দের কাছে শুনলাম তোমার নাকি শরীর খারাপ হয়েছিল, শেষ পর্যন্ত না দেখেই—'

'তাই খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে বুঝি ? কেমন আছি দেখতে ?' এই অন্ধকারে কী অবাস্তব শোনাচ্ছে শান্তির গলা, মুখটাকে মুখোশ-পরা মনে হচ্ছে। দেখতে দেখতে সেই মুখোশের নিচেকার কুণ্ঠন যেন একেবারে মিলিয়ে গেল, বিছানায় ফিরে এসে মণীন্দ্রকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল শান্তি। 'তোমার নাটকে আমাকে একটা পার্ট দেবে ?'

অভিভূত হয়ে গেল মণীন্দ্র। বিহ্বল, কণ্ঠাশ্লিষ্টা শান্তিকে দূরে ঠেলে দিয়ে বলল, 'কী বলছ ?'

আবার উঠে বসল শান্তি। মুখোশমুখের ঠোঁট দুটি কঠিন হয়ে একটু-খানি বেঁকে গেল শুধু। '—কেন আমারই জীবন, আমারই চরিত্র, আমি পার্ট করতে পারব না ?' গলে যাওয়া গলায় বললে, 'তোমার চামেলী, দামিনী চপলার চেয়ে আমি ঢের ভালো করব দেখো!'

নিস্পন্দ মণীন্দ্র পরমুহূর্তেই শান্তিকে হাসতে শুনল। হাল্কা, ঝরঝরে হাসি, কোঁচড়ে তেঁতুল বীচি নিয়ে আস্তে আস্তে ঝাঁকানোর মতো ; 'তুমি এ মন্দ ফন্দি বার করোনি কিন্তু। ঘরের কথা নিয়ে নাটক লেখা। টাকা উপায়ের মন্দ পথ নয়। কিন্তু আমার পার্ট নেওয়াতে আপত্তি করচ কেন। এসো না—' প্রগলভ, দ্রুততরল গলায় শান্তি বলে গেল 'এসো না, তাতে তো আরো বেশি টাকা ? ঘরের কথা যখন, টাকাটা বাইরে যায় কেন।'

আর শোনা যায় না, শান্তির এই নিষ্ঠুর নিশ্চিন্ত কণ্ঠের অক্লান্ত প্রলাপ। দরজা খুলে বেরিয়ে এল মণীন্দ্র। কপালে রগ দুটো চমকাচ্ছে ; ঠাণ্ডা হাওয়া লাগুক একটু।

আর, রুদ্ধশ্বাস ঘরে, বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে দিল শান্তি। চোখের জলে সব ভেসে যাচ্ছে, যাক। সমস্ত দেহ জুড়ে আকুল অশ্রুময় একটা চেতনা টলটল করছে, পোড়া দু'টো চোখ দিয়ে বেরুতে পারে তার কতটুকু।

সব কিছু ব্যর্থ হয়েছে সন্দেহ নেই। মণীন্দ্রের চোখের সমুখে এতদিন ধরে যা কিছু করেছে শান্তি, অন্য কোন স্বামী হলে পাগল হয়ে যেত। অথচ মণীন্দ্র সব জানত, চোখ দু'টো ওর খোলাই ছিল, কিন্তু সে চোখ জ্বালা করেনি ; মনে মনে সব কিছু টুকে নিয়েছে, আর এতদিন পরে মণীন্দ্র ওর নাটকে সব জুড়ে দিয়েছে।

আজ এতদিন পরে শান্তির মনে হ'ল এত যে ওকে যথেচ্ছাচারের

স্বাধীনতা দিয়েছে মণীন্দ্র, দেখেও না-দেখার, বুঝেও না-বোঝার ভাণ করছে, এর পেছনে একটা সুপরিকল্পিত আয়োজন আছে। মনে মনে হয়ত এমনি একটা চরিত্র এসেছিল মণীন্দ্রের, শুধু কল্পনার কিছুটা ফাঁক ছিল। শান্তিকে আপন-পথে চলতে দিয়েছে শুধু ভালো করে দেখতে, ফাঁকটুকু ভরবে বলে।

রিয়েলিস্ট আর্টিস্ট মণীন্দ্র, মনহীন মননশিল্পী ; শান্তি ওর রসসৃষ্টির রসায়নে গিনিপিগ ছাড়া কিছু না।

শেষ একটা দীর্ঘনিশ্বাসের সঙ্গে সমস্ত কান্না যেন শুকিয়ে গেল শান্তির। বালিশ থেকে মুখ তুললে আস্তে আস্তে। সারামুখে ভিজে দাগ, গালের সঙ্গে লেগে আছে দু'একটা তুলোর আঁশ, দু' একটা বা চুল ; সিঁদুরের টিপটি গলে গলে ছড়িয়ে পড়েছে সারা কপালে।

অল্প একটুখানি হাসিও ফুটে উঠল মুখে। এতবড় ভুলও মানুষে করে। সে কিনা ভেবেছিল ইন্দ্রজিৎকে ঈর্ষা করবে মণীন্দ্র। এত বছর ধরে মন নিয়ে নাড়াচড়া করে করে মণীন্দ্রের নিজের মন শক্ত হয়ে গেছে। এখানে বসে ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে যখন তাস কিম্বা বাঘবন্দী খেলেছে শান্তি, মণীন্দ্র হয়ত পর্দার ও-পাশ থেকে চেয়ে দেখেছে ; পোষা একটা বেরালকে যেন ঘটা করে শান্তি আদর করছে, মণীন্দ্রের মুখটা এমনি প্রশ্রয় প্রসন্ন।

শান্তির হাতের খেলনা ইন্দ্রজিৎ ; মণীন্দ্রের হাতের খেলনা শান্তি। চক্রাকার খেলার ছক।

আঁচলে ভালো করে ঘষে ঘষে মুখটা পরিষ্কার করল শান্তি। চুলটা ঠিক করে, কাপড়-চোপড় গুছিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। এত সহজে সে হার মানবে না। খেলা তো একদানেই ফুরোয় না।

১১

সারাদিন সবাই ঘোরে আপন আপন ধান্দায়, সন্ধ্যের ঠিক মুখে মুখেই একে একে জড়ো হয় আস্তানায় ; কিনু গোয়ালার গলির সেবাসত্রে।

স্টোভে জল চাপিয়ে শকুন্তলা সম্মুখে বসে আছে ; আর ছোট মোড়া নিয়ে শকুন্তলাকে ঘিরে বসেছে মেয়েরা ; অণিমা, গীতা, স্টেলা। কোন কোন দিন কলেজ-ফেরৎ নীলাও এসে জোটে।

জলে চায়ের পাতা ফেলে ঢাকনাটা ভালো করে ফের এঁটে দিয়ে শকুন্তলা বলে, 'কী আছে তোদের কাছে, হিসেব দে সব একে একে।'

'শকুন্তলাদি যেন কাবুলীওয়ালার মতো করে। দাঁড়াও, চা খেয়ে জিরিয়ে নিই।'

অণিমা আর গীতা আজ পেয়েছে পাঁচ টাকা করে। স্টেলা কিছু বেশি, দশ টাকা।

কুড়ি টাকা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে শকুন্তলা বলে, 'শুরু হিসেবে মন্দ না। তবে আরো চাই। রোজই কিছু কল্ আসবে না। বাড়িটাও কিছু মেরামত

করা চাই। খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিতে পারলে ভালো হত।'

'সব আস্তে আস্তে হবে শকুন্তলাদি।'

হবে, তা শকুন্তলাও জানে। অনেক খোয়ানোর পরেও এই আশাটুকু ছিল বলেই না শকুন্তলা আজ এই ক'টি মেয়েকে এক করতে পেরেছে। অনেক বান-ভাসির পর পায়ের নিচে আশ্বাস পেয়েছে স্বনির্ভর, কঠিন মাটির। নার্সের জীবনের মহান ব্রতের উল্লেখেই গদগদ ডাক্তার উপাধ্যায়ের দলের কাছ থেকে যে সম্মান, যে স্বীকৃতি এই মেয়েরা পায়নি, এদের সেই জীবনের খোঁজ দেবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে শকুন্তলা।

চোখের সমুখে মিছিলের মতো একে একে চলে যায় হাসপাতালের ছবিগুলি। অল্প মাইনে, অতিরিক্ত খাটুনি। তিক্ত মেজাজ নিয়ে আর্তদের বিছানায় ঘুরে বেড়ানো; দীর্ঘরোগশীর্ণ আত্মীয়-স্বজনের কাছছাড়া শয্যাশায়ীর দল কী করুণ, রুগ্ন আগ্রহে ওদের দিকে চেয়ে থাকত; হয়ত প্রত্যাশা করত একটুখানি মমতাকোমল ছোঁয়া; খেত ধমক। নিজেরা পেত ফাঁকি, দিতও ফাঁকি, চলছিল মন্দ না। ডাক্তার উপাধ্যায়ের শূন্যগর্ভ বড়ো বড়ো কথার বুদ্বুদ সেই ফাঁকির আকাশে উড়ত।

তার চেয়ে এই ভালো। এও কিছু বিনিসুতোর মালার ব্যবসা নয়, এখানেও টাকা-পয়সার হিসাব আছে। কিন্তু নিজেদের রুটি এখানে রুচির সঙ্গে বাঁধা; পাওয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আছে প্রয়োজনের। ঠকবেও না, ঠকাবেও না।

মুখটা যথাসম্ভব কম ফাঁক করে হাই তুললে শকুন্তলা। সারা দুপুর ঘুমিয়ে শরীরে একটা মেদমন্থরতা এসেছে। ওর ঘুমভাঙা মুখখানা নাকি দেখতে ঠিক বাঘিনীর মতো হয়, মেয়েরা বলে। বাঘিনী? কতই যেন বাঘিনী দেখেছিস তোরা। কাটিয়েছিস চিরকাল কলকাতা শহরে, ফুটপাত থেকে ট্রাম, ট্রাম থেকে নেমে আবার ফুটপাতে।

চায়ে চমুক দিতে দিতে শকুন্তলা বললে, 'তোর আসতে আজ এত দেরি দেখে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম গীতা। বুড়ো খোকা ছাড়তে চাইছিল না?'

'না কুন্তলাদি। ওষুদ খাইয়ে কম্বল চাপা দিয়ে চলে আসছি, বুড়ো ডেকে বলে বই পড়ে শোনাও।'

'আর তুই অমনি শোনাতে বসলি?'

'শোনাব না? রোজ হিসেবে পাঁচ টাকা। আমাকে ছাড়া আর কাউকে বুড়োর বিশ্বাস নেই। ছেলে, বৌ, নাতি নাতনী কাউকে না। বলেছে, সেরে উঠে আমাকে নিয়ে তীর্থে চলে যাবে।'

'বলিস কী। একেবারে কেটে পড়ার মতলব?'

'না। বুড়োর মন খুব ভালো। আমার জন্যে বুড়ো আবার পাত্রও খুঁজছে শকুন্তলাদি।'

'তোর অধঃপতন দেখে দুঃখ হয় গীতা। নিজে একটা জোটাতে পারলি না, শেষ পর্যন্ত একটা বুড়োর শরণাপন্ন হতে হল ঘটকালির জন্যে?'

কাঁধে একটা তোয়ালে নিয়ে স্নান করতে চলে গেল শকুন্তলা।

'তৈরি হয়ে নিইগে। তোরা একটু ব'স। আমার তো আবার রাতজাগা আছে।'

রাত্রের কাজগুলো শকুন্তলা নিজেই নেয়। বলে, 'রাত্রে তোদের পাঠিয়ে ভরসা হয় না। কাঁচা বয়স সব, ফিরতে যদি না দেয়?'

আসলে সবাই জানে এটুকু শকুন্তলা করে দায়িত্ববোধ থেকে। এখনো ছেলেমানুষ ওরা। সারাদিন যে খাটছে, দু'পয়সা ঘরে আনছে, এই ঢের। কাজ কী ওদের ঘাড়ে রাত জাগার খাটুনি চাপিয়ে। এ বাসরে তো ফুলশয্যা নেই, জাগাটুকু আছে।

স্নান করে ফিরে এল শকুন্তলা। এখনো অল্প অল্প জল লেগে আছে চোখের পল্লব, সিঁথিপ্রান্তে; কানের লতিতে দু'ফোঁটা ঝুলছে দুলের মতো। শুকিয়ে আসা সাবানের ফেনা এখনো লেগে আছে ঘাড়ের কাছে, নাকের ডগায়, চিবুকে, গলায়।

ঢিলে সেমিজের ওপর আলগা করে, শুকনো একটা শাড়ি কোমরে এক-ফেরতা জড়িয়েই চলে এসেছে শকুন্তলা, এটা ভেজালহীন মেয়ে রাজ্য, এখানে অত জড়োসড়ো লজ্জার প্রয়োজন নেই।

শুকনো আঁচল দিয়ে মুখটা রগড়ে শকুন্তলা সবার মুখের দিকে তাকাল।

'কী দেখছিস হাঁ করে?'

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হাসতে হাসতে অণিমা বললে—'তোমাকে। তোমাকেও বাইরে পাঠিয়ে ভরসা পাইনে শকুন্তলাদি। এই রূপের সিকিও যদি আমাদের থাকত—'

'সিকি?' শাড়ি দিয়ে ডুলির মতো শরীরটাকে ঘিরে, দাঁত দিয়ে পাড়ের কাছে চেপে জামা পরছিল শকুন্তলা। পেছন ফিরে। ঘাড়ের ওপর দিয়ে ফিরে চেয়ে বলল, 'সিকি কেন, দু'আনি থাকলেও বর্তে যেতিস; কিন্তু টাকা হয়েই কি সুখে আছে রে, দেখছিসনে খালি গোল হয়ে গড়াচ্ছি?' ঈষৎ রোমধূসর, পরিপুষ্ট বাহু সমুখের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এসব দেখেও কেউ আমার কাছে এগোতে সাহস পাবে ভেবেছিস? বয়সকে না হোক চর্বিকে তো দূর থেকেই দণ্ডবৎ করবে।'

শকুন্তলা সাজ-পোষাক পরে বেরুবে বলে তৈরি, ঠিক সেই সময়ে এল ললিতা। যখনই আসে এমনি শব্দ না করেই আসে; দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে, একপায়ে ভর করে চৌকাঠে ঠেস দিয়ে জুতো ছাড়ে; কৃশশ্যাম আরেকটি পায়ের আভাস যে সকলের চোখে পড়ছে, সেটুকু বুঝি টের পায় ললিতা, লজ্জায় মাথা তুলতে পারে না।

শকুন্তলা বলে, 'জুতো পায়েই ঘরে ঢোক্ ললিতা। এটা নিষ্ঠাবতী বিধবার ঘর নয় যে জাত যাবে।'

ললিতা আরো সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে, শীর্ণ শ্যামল কপোলে আরো একটু লাজুক রক্তের ছোপ লাগে।

অণিমা বলে, 'পালিয়ে এলি বুঝি ললিতা ?'

এতক্ষণে ললিতা চোখ তুলে চাইলে। 'কেন, আমি বুঝি এমনি আসি না ?'

বড়ো করে একটা শ্বাস ফেলে শকুন্তলা কপট ক্ষোভের সুরে বলে, 'কই আর আসিস ললিতা। তোর সেই মেডিকেল স্টুডেণ্টটিকে পেলে কি আর আসিস। ভারি হিংসে হয়। কবে একদিন ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া হয়ে যাবে। বল না, কী দেখে ভুলেছিস। সে কি আমার চেয়েও বেশী সুন্দর ?' গ্রীবাভঙ্গি করে শকুন্তলা তাকাল।

স্নানমসৃণ মুখ, টানা ভুরু, শক্ত করে বাঁধা চুল। সেদিকে তাকিয়ে কথা বলতে গিয়ে ললিতার গলা কেঁপে গেল। কাঁদো কাঁদো মুখভঙ্গী করে বলল, 'কেন কুন্তলাদি, আমি তো আসি। ফুরসুৎ পেলেই আসি।'

'সেই ফুরসুৎই আজকাল বড়ো কম পাচ্ছিস ললিতা। বরাবরের জন্য আসবি বলেছিলি, আজো এলি না। আমরা সব সদর দরজা দিয়ে গট গট করে বেরিয়ে এলাম পথে, আর তুই এখন আবার ঘুরে গিয়ে খিড়কির দরজায় ঘা দিচ্ছিস, কখন দরজা খুলবে এই আশায়।'

শকুন্তলার নেহাৎ যাবার সময় হয়ে গিয়েছিল, তাই। নইলে আর কিছুক্ষণ ওর কথার ছুরি সইতে হলে ললিতা কেঁদে ফেলত।

কথার যখন কোন জবাব থাকে না, সারা মন হাতড়েও পাওয়া যায় না কোন কৈফিয়ৎ, কান্না আসে তখনই। মনে মনে ললিতাও তো জানে, যত তীর-তীক্ষ্ন করেই বলুক, সত্যি কথাই বলছে এরা।

কিন্তু এদের কাছে প্রাণ গেলেও ললিতা স্বীকার করতে পারবে না, আজো অরবিন্দ—সেই সিক্স্থ্ ইয়ারের স্টুডেণ্টটি—আসবে বলে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিল ; একসঙ্গে সিনেমায় যাবে বলে ঠিকও ছিল। নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থানে মিনিটের পর মিনিট অপেক্ষা করেছে ললিতা। দেড় ঘণ্টার ওপর। তারপর সাতটাও বেজে যেতে চলে এসেছে এখানে।

খিড়কির দরজায় ঘা দিচ্ছে ? কে জানে শকুন্তলাদি ঠিক কথাই বলেছে কিনা। কিন্তু নিভৃত একটি পরিচ্ছন্ন সংসার কল্পনা করে ললিতা এখনো মনে মনে, ক্লান্ত দিনের শেষে ও বিনিদ্র রাতে, রঙিন হয়ে ওঠে সন্দেহ নেই। এদের সেবাসত্রের পরিকল্পনায় সেও উৎসাহের সঙ্গে সায় দিয়েছিল। কিন্তু সে বুঝি ঝোঁকের মাথায়। আসলে ললিতা ব্যগ্র হয়ে উঠেছিল হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্যে। আর ভালো লাগে না এই রোগ রোগীর নিরন্তর ক্লান্তি। টেম্পারেচার চার্ট লিখে লিখে হাত আর সরে না, এর চেয়ে ধোবার হিসেব লিখতে পেলে ললিতা ঢের বেশি খুশি হত। মেজার গ্লাসে ওষুধ নিয়ে বিবর্ণ মুখগুলোর কাছে যাওয়ার চেয়ে সন্ধ্যাবেলা চিনি আর লেবু-মেশানো সরবৎ একটি বলিষ্ঠ মুগ্ধ হাতে তুলে দেওয়া ঢের বেশি মধুর।

ঠিক সেই সময়ে সদরে কড়া নড়ে উঠল। শকুন্তলা জানালা থেকে ঝুঁকে পড়ে নিচে তাকাল।

'অসময়ে আবার কে। আজ আর বেরুতে দেবে না দেখছি।'

ঠিকে ঝি বুঝি দরজা খুলে দিয়েছিল ; একজোড়া জুতো সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছে একেবারে দোতলায়। গলা খাঁকারি দিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, 'শকুন্তলা দেবী আছেন?'

শকুন্তলা বললে, 'দেখে আসি আবার কে। ঝি, ওঁকে অফিস ঘরটাতে বসতে বলো।'

সিঁড়ির ঠিক সমুখে পাশের ঘরটারই নাম অফিস ঘর। ভেজানো দরজা ঠেলে শকুন্তলা সে ঘরে ঢুকে গেল।

ঢুকতে গিয়েই শকুন্তলা যে দু'পা পিছিয়ে এসেছিল, সেটা এ-ঘরে কারুর চোখে পড়ল না। সবাই উৎকর্ণ হয়ে আছে ; ও-ঘরের আলাপের ছিটে-ফোঁটাও যদি ছিটকে আসে এ-ঘরে।

বিবর্ণ গলায় শকুন্তলাকে বলতে শোনা গেল, 'আপনি!'

ভারি গলায় জবাব এল, 'আমি। কিন্তু আগে তো তুমি আমাকে তুমি বলতে, না? অবশ্য ঠিক মনে নেই। কম বছর কেটে গেল না। বসতে বলবে, না চেয়ার টেনে নিয়ে নিজেই বসব?'

'বসুন।'

চেয়ার টানার শব্দ শোনা গেল।

'কী দরকারে এসেছি সেটা চটপট বলে ফেলতে এখুনি বোলো না, এই অনুরোধ। একটা সিগারেট ধরাতে দাও, এদিক ওদিক তাকিয়ে-টাকিয়ে সব দেখি-শুনি।'

'আমার ঠিকানা কোথায় পেলেন?'

ফস করে দেশলাই জ্বালানোর শব্দ এল। 'তিরিশের ওপর বয়স হল তোমার শকুন্তলা, এখনো বড়ো ছেলেমানুষের মতো প্রশ্ন করো। আমি এক-জন ঝানু সাংবাদিক, জানো না। সারা দুনিয়ার খবর আমার নখাগ্রে,—আর কলকাতা শহরে চেনা অথচ হারানো একটা মানুষের ঠিকানা সংগ্রহ করতে পারব না, আমাকে এমন অপদার্থ ভাব নাকি।'

'আমি তো হারাইনি। স্বেচ্ছায় চলে এসেছিলাম।'

দাঁতে জিভ ঠেকিয়ে আপসোসসূচক একটা অব্যয় উচ্চারণ করতে শোনা গেল আগন্তুককে। 'জানি, তুমি হারাওনি, হারিয়েছিলাম আমি। তুমি কিন্তু বেশ মোটাসোটা হয়েছ শকুন্তলা, তোমাকে দেখলে ভালো-করে-যে-ফোটেইনি সেই মেয়েটিকে মনে পড়া শক্ত।'

কঠিন সুরে শকুন্তলাকে বলতে শোনা গেল, 'কাজের কথা বলুন। ও-ঘরে সব মেয়েরা রয়েছে।'

'মেয়েরা? ও-হো, তোমার সেই আশ্রম-বালিকাদের কথা বলছ? দুষ্মন্তদের আসবার সময় বুঝি এল। আমাকে একটু আগে থেকে বলে দিও, ঠিক সময়ে চলে যাব।'

'আপনার চলে যাবার সময় এসেছে।'

সজোরে সিগারেটে টান দেবার শব্দ এল। আগন্তুক বললে, 'তাড়িয়ে দেবার বেশ মোলায়েম পদ্ধতি আবিষ্কার করেছ দেখছি। কিন্তু তুমি আমাকে মিছিমিছি সন্দেহের চোখে দেখছ শকুন্তলা। দেখছ না, আমি একেবারে বদলে গেছি। তোমাকে ছুঁয়ে বলতে পারি, একেবারে সেরে গেছি আমি। বুকের ছাতি আটত্রিশ, আমি এখন একজন সুস্থ, সবল নাগরিক। জেনে সুখী হবে শকুন্তলা, আমি ফের বিয়ে করেছিলাম। একটি ছেলেও হয়েছে আমার? আশ্চর্য হচ্ছ?'

'আশ্চর্যের কী আছে।'

'হ্যাঁ। ছেলে আছে আমার। সে অন্ধ, বিকলাঙ্গ কিছু হয়নি—শুনেও অবাক হচ্ছ না?'

'না। কিন্তু আপনি এবার আসুন। আমারও দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'এখনই দেরি? সবে তো আটটা। তোমাদের রাত বুঝি এত তাড়াতাড়িই শুরু হয়ে বায় শকুন্তলা? থাক আর ভ্রূকুটি কোরো না। কাজের কথা নিয়েই এসেছিলাম। দরজাটা ভালো করে ভেজিয়ে দাও, বলি।'

আর কিছু শোনা গেল না। প্রায় মিনিট পাঁচেক পরে সিঁড়ি দিয়ে এক জোড়া জুতো নেমে যাওয়ার শব্দ পাওয়া গেল। তখনো ঘরের দরজা ভেজানো। শকুন্তলার সাড়া নেই।

আস্তে আস্তে দরজা ঠেলে ভেতরে তাকাল মেয়েরা। পা টিপে টিপে এগিয়ে গেল। টেবিলের ওপর রাখা হাত দুটির মধ্যে মুখ ঢেকে বসে আছে শকুন্তলা। ওদের পায়ের শব্দে মাথা তুলল। কম্পিত পল্লবের নিচে থমথমে চোখ, ঈষৎ রক্তাভ।

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়িয়ে শকুন্তলা চুল ঠিক করে নিল। বিবর্ণ গলায় বললে, 'বড্ড দেরি হয়ে গেল। কাল থেকে একটা নেপালী দারোয়ান রাখতে হবে দেখছি।'

আর কোন কথা বলল না শকুন্তলা, জোড়া জোড়া চোখে কণ্টকিত কৌতূহলের জবাব দিল না। বাইরে থেকে দরজা ভেজিয়ে নেমে গেল।

পরদিন দুপুরে ক্লাশ ছিল না। খেয়ে উঠে নীলা ছাতে গিয়ে চুল শুকোচ্ছিল। হঠাৎ দেখতে পেলে ও-বাড়ির জানালা থেকে শকুন্তলা ওকে ডাকছে।

'কী করছেন? আসুন না, একটু গল্প করি।'

মেয়েরা সব যে-যার কাজে বেরিয়ে গেছে। শকুন্তলার স্নান সারা। চোখে মুখে নেই রাত জাগার ক্লান্তি, কিংবা কাল সন্ধ্যাবেলার গ্লানির লেশও। মাথায় দু'বালতি জল ঢালতেই সব বুঝি ধুয়ে মুছে গেছে। মুখের রেখা কটি আবার সহজ হয়ে এসেছে, একটু চাপা নাকটির দু'পাশে চোখ দুটি আবার পরিহাসতরল।

বালিশের ওপর মাথা রেখে শকুন্তলা শরীরটাকে যেন দীর্ঘতর করে দিয়েছে আলস্যে। পানও খেয়েছে বুঝি একটা। লঘু গলায় নীলাকে

জিজ্ঞাসা করলে, 'কাল সন্ধ্যাবেলা আপনি খুব অবাক হয়েছিলেন না ?'

নীলা স্মিতকুণ্ঠিত মুখে চেয়ে রইল, কিছু বলল না।

'জিজ্ঞাসা করবেন না কিছু ?' আজ একেবারে স্বচ্ছন্দ শকুন্তলা, সব কথা খুলে বলবে বলে বুঝি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

'কে এসেছিল কাল ?' দ্বিধাজড়িত গলায় নীলাকে অগত্যা জিজ্ঞাসা করতে হল।

'চেনেন না ? বনমালী সরকার আজকাল ডাকসাইটে সাংবাদিক একজন, ওকে চেনেন না ? তুষ্ট হলে কাগজে কাগজে 'সেবাসত্রে'র প্রশস্তি ছাপা হয়ে যায় এক্ষুণি। আবার—' একটু থেমে শকুন্তলা বলে, 'আবার রুষ্ট হলে কেচ্ছার ঢাকও বাজাতে পারে।'

'আমার সঙ্গে কী সম্পর্ক ভেবে অবাক হচ্ছেন ? না, না, যা ভাবছেন তা নয়। প্রেমিক ট্রেমিক নয়। আমার স্বামী ছিল।'

'আপনার স্বামী।'

যত চপলতা ছিল সব গলায় ঢেলে দিয়ে শকুন্তলা বললে, 'কেন, নার্স-গিরি করছি বলে আমাদের স্বামীও থাকতে নেই নাকি। শুনুন তবে, এই বনমালী সরকারের সঙ্গে আমার একদিন রীতিমত মন্ত্র পড়ে, অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে হয়েছিল। ওর সঙ্গে আমি ছ'মাস ঘরও করেছি। আরও শুনবেন ? স্টোভটায় চায়ের জল চাপিয়ে দিন না একটুখানি। আমার ভাই আজ উঠতে ইচ্ছা করছে না।'

শুয়ে শুয়ে বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুল দিয়ে ডান পায়ের পাতা ঘষতে ঘষতে শকুন্তলা বললে।

১২

সেদিন আস্তে আস্তে ওর কাহিনী বলেছিল শকুন্তলা। একটি একটি করে বাদাম ছাড়িয়ে খাওয়ার মতো ; শরীরের লুকোনো ক্ষত দেখানোর মতো। ক্ষত আর কই, শুকিয়ে গেছে ; দাগটুকুও আজ চোখে পড়ে কি না পড়ে।

উপুড় হয়ে চায়ের পেয়ালায় একটু একটু করে চুমুক দিচ্ছে শকুন্তলা, খোলা চুলের রাশি পিঠ ছাড়িয়ে সারা বালিশে ছড়িয়েছে ; তার ছায়ায় ওর চোখ দুটিকেও নীলার মনে হয়েছে বনসরসীর মতো অস্পষ্ট, ধূসর।

'আমারো বিয়ে হয়েছিল', বললে শকুন্তলা, 'ওই বনমালী সরকারের সঙ্গে। তারপরেরটুকু শুনুন এবার।'

'বিয়ে হল, কিন্তু লোকটাকে ভালো লাগল না। কোনদিনই লাগত না, আমার বিয়ের আগেই আমার মার বাসায় যেত কি না। আমার মা ছিলেন মিড্‌ওয়াইফ। আমরা ভাই দু'পুরুষের ধাত্রী।

'ওই স্থূল চেহারা, কর্কশ স্বর, খেলো রসিকতা, সব মিলিয়ে লোকটাকে কেমন ইতর, স্থূলপ্রকৃতির মনে হত। তবুও আপত্তি করলাম না। দাইয়ের

মেয়েকে এত কম টাকায় আর কেউ বিয়ে করতে রাজি হত না।

'বিয়েও করলাম, এমনকি স্বামীকে ভালোবাসা দিতেও তৈরী হয়েই ছিলাম। বাঙালীর মেয়ে, স্বামীকে ভালো না লাগলেও ভালোবাসা দিতে জানে। আর ভাই, ছুঁয়ে বলছি আপনাকে, দরকারও হয়েছিল। বয়স কুড়ি পার হয়েছিল, স্বাস্থ্য আমার বরাবরই ভালো, ষোল থেকে একুশ পর্যন্ত কাটিয়ে দিয়েছি কোনরকমে দাঁতে দাঁত চাপা কৃচ্ছতার ভেতর দিয়ে, আর পারছিলাম না। ভাবলুম, বিয়ে হলে মন না বাঁচুক, শরীরটা তো বাঁচবে। দু'টোকে এক-সঙ্গে বাঁচিয়ে রাখা যখন যায় না, গেলই না।

'আপনার বিয়ে হয়নি ভাই, সব কথা বুঝতে পারবেন না। তবু আভাসে আপনাকে বলি, আশা পূরল না। দুদিক থেকেই ঠকলাম, না ভরল মন, না জুড়াল দেহ।'

'কেন?' আবিল, অলসরক্তিম চোখে শকুন্তলা ওর দিকে চেয়ে আছে; নীলা মোহাচ্ছন্ন ক্ষীণ গলায় জিজ্ঞসা করল, 'কেন?'

'কেন?' নীলার প্রশ্নটার পুনরাবৃত্তি করল শকুন্তলা, একটুখানি হাসল। 'বিয়ের পর প্রথম ক'দিন ও বুঝতে দেয়নি। নানারকম ছুতো করত। তারপর একদিন—এক সপ্তাহ না যেতেই সব জানলুম। আমার স্বামীর দেহ কীটদষ্ট। ধাত্রীর মেয়ে তো আমরা, সহজেই বুঝতে পারি। জোর করে জিজ্ঞাসা করলাম যখন ও আর লুকোতে পারলে না। স্বীকার করল অকপটে। মেসে থাকতে বয়স বত্রিশ হয়েছিল, অথচ বিয়ে করার সামর্থ্য হয়নি, ওকেই বা দোষ দিই কী করে। বেশি নয়, একদিন দুদিন কি তিন দিন; ওই যথেষ্ট। ক্ষণস্বর্গ কিনেছে অক্ষয় রোগভোগের নরকে।

'স্তম্ভিত ভাবটা কাটতে দেরি হয় না। কান্নাকে শুকিয়ে দিলুম মনের জ্বালায়। কঠিন গলায় ওকে জিজ্ঞাসা করেছিলুম মনে আছে, "তবে আমার এ সর্বনাশ করলে কেন।" মাথা নিচু করে বসে ছিল। বললে, "কি করব, লোভ সামলাতে পারিনি। এখন অনুতাপ হচ্ছে।"

'অনুতাপ কথাটায় হাসি পেয়েছিল। ওতে শাস্ত্রীয় প্রায়শ্চিত্ত হয়ত হয়, কিন্তু ক্ষতিপূরণ হয় না।'

'তারপর?' নীলা জিজ্ঞাসা করল।

বালিশটা ভালো করে কনুইয়ের নিচে টেনে নিল শকুন্তলা, কিছুক্ষণ দু'হাতে মুখ ঢেকে রইল। ভাঙা গলায় বলল, 'সবই বলব। আসল পরীক্ষা শুরু হল তারপর। একসঙ্গে আর থাকা চলে না। আলাদা বিছানা হল। শেষে আলাদা ঘর। কিন্তু দু'ঘরের মধ্যেও তো ছিটকিনি থাকে। লজ্জার কথা কী বলব ভাই, আমি ওকেই যে শুধু বিশ্বাস করতে পারতাম না তা নয়, নিজেকেও না। কী মর্মান্তিক, দেহান্তক জ্বালায় আরো প্রায় দু' সপ্তাহ কেটেছিল, আপনাকে বোঝাতে পারব না। আলাদা ঘরের দীর্ঘ রাত্রিজোড়া একাকিত্ব যেন আগুনের মত লকলকে হয়ে পুড়িয়েছে। চোখে আগুন, জিভে আগুন, ঠোঁটে, বুকে। কলে গিয়ে জল ঢেলেছি, তবু নেবেনি। শেষে একদিন

ছিটকিনিও খুলেছিলাম !'

'খুলেছিলেন ?'

'হ্যাঁ, তারপর দিন থেকে, খবরের কাগজে কাজ করত তো ও, বরাবরের মতো নাইট ডিউটি নিলে। বললে, 'এই ভালো। তোমার দেহে এ-রোগ আমি সঞ্চারিত করে দিতে চাই না।' আমিও বললাম, 'সেই ভালো। অন্ধ, বিকলাঙ্গ সন্তান সইতে পারব না।' কিন্তু এ তো ভাই পেছনে হটা হল, সমস্যার সমাধান তো নয়। আরো প্রায় মাসখানেক কেটে গেল। রোজ রাত্রি ন'টা বাজতেই ও বেরিয়ে যেত, আর আমি দরজায় খিল দিয়ে একা একা কাটাতাম। শেষে একদিন নিজেই ঘুচিয়ে দিলাম, মিথ্যা, ধিক্কৃত স্ত্রীজীবন। ও বাড়ি ছেড়ে এলাম। সিঁথি থেকে মুছে দিলাম সিঁদুরের ঠাট্টাটা। হাসপাতালে চাকরি নিলাম।'

আবার বালিশে মুখ রেখে অনেকক্ষণ ধরে দম নিলে শকুন্তলা। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে চুল আলগোছা বাঁধতে বাঁধতে বললে, 'আজ এতদিন পরে ও এসেছিল। সেরে গেছে। আবার বিয়ে করেছিল, সুস্থ সবল ছেলেও হয়েছে একটা, শুনিয়ে গেল। সমাজে ওর ঢের প্রতিপত্তি ;—সেই বৌটা মারাও গেছে। বলে গেল আমাকে আবার ফিরে নিতে চায়। বলুন তো যাব কিনা।'

'কী জানি, যা ভালো বোঝেন করবেন।'

'ক্ষেপেছেন আপনি। আর কি ফেরা চলে। হাসপাতালে কাজ নিয়ে আমি লোক তো কম দেখলুম না ; সাধু, মতলববাজ, প্রৌঢ়, মিনমিনে তরুণ। জীবনকে দেখেছি অনেক দিন থেকে। অনেক আঘাত অনেক প্রলোভন। আজ আর আমার কোন মোহ নেই। এত রুগ্ন জীবন দেখেছি বলেই না সঙ্গে সঙ্গে এর পটভূমিকায় সুস্থ বলিষ্ঠ জীবনও আমি কল্পনা করতে পেরেছি ! শরীরকে ঘুম পাড়িয়েছি কিন্তু মনকে জাগিয়েছি সাহস দিয়ে। তারপর এই ক'টি মেয়েকে নিয়ে গড়ে তুলেছি এই সেবাসত্র। এরা আমার মুখ চেয়ে আছে। এখন এদের ফেলে সব ভেঙে দিয়ে, হাতা খুন্তি ধরতে গেলে লোক হাসবে যে।'

ওপরের দিকে তাকিয়েছিল ইন্দ্রজিৎ, নীলার পায়ের শব্দে চেয়ে বলল, 'আসুন।' একটু হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'অবিশ্যি শুধু আসুনই বলতে পারি। বসুন বলব যে, এ-ঘরে এমন একটা বাড়তি আসবাব নেই।'

'কী করছিলেন শুয়ে শুয়ে।'

'কড়ি কাঠ। পুরোন বাড়িগুলোর এই একটা মস্ত সুবিধে নীলা দেবী, কড়ি কাঠ থাকে, গোনা যায়। নতুন বাড়িগুলোয় কড়িকাঠ থাকে না, অন্য-মনস্ক হবার একটা স্থির অবলম্বন থেকে ওখানকার বাসিন্দারা বঞ্চিত।'

'এখন তো সেরে গেছেন', নীলা শিয়রের জানালা খুলে দিয়ে বললে, 'একটু আধটু ঘুরে এলেও পারেন। দেখুন তো বাইরে কী চমৎকার রোদ।'

লম্বা লম্বা আঙুল দিয়ে দীর্ঘ, অবিন্যস্ত চুল পেছন দিকে ঠেলে দিয়ে ইন্দ্রজিৎ দেয়ালে পিঠ দিয়ে উঠে বসল।

ক্লান্ত গলায় বলল, 'যাব তো। কিন্তু কোথায়; কার কাছে।' তক্তপোশ-টারই একটা প্রান্ত দেখিয়ে বলল, 'বসুন না ওখানে। তবু ভালো আপনি এলেন। কথা বলার লোক পাওয়া গেল।'

হঠাৎ কী মনে হল নীলার, জিজ্ঞাসা করে বসল, 'শান্তিদি আসেন না?'

'কই আর আসেন।' শীর্ণ পীত চিবুকে হাত বুলিয়ে কর্কশতা অনুভব করতে চেষ্টা করল ইন্দ্রজিৎ। 'এলেও চলে যান। তবে দু'বেলা বরাদ্দ দু'থালা ভাত ঠিকমতোই জুটছে, এই যা।' বোকার মতো নিরর্থক একটু হাসি যোগ করে বলল, 'বসতে বলতেও ভরসা পাইনে এখন। হয়ত শুনতে হবে মাথা ধরেছে, কিংবা কাজ আছে। বলতে পারেন কী এত কাজ পড়েছে শান্তি-বৌদির।'

নীলা বললে বটে, 'কী জানি', কিন্তু কিছু জানত বৈকি। মণীন্দ্রের প্রথম বইটার ত্রিশ রজনী হয়ে গেল, দ্বিতীয় একখানা নাটকও সমাপ্তপ্রায়। আজ-কাল বাইরে বাইরেই কাটে মণীন্দ্রের বেশীর ভাগ সময়। শান্তিও ঘোরে বাইরে বাইরে। ইন্দ্রজিৎকে দিয়ে হয়নি, মণীন্দ্রকে জব্দ করার কঠিনতর পথ শান্তি বুঝি পথে পথেই খুঁজছে।

কিছুদিন আগে হলে নীলা শান্তিকে হয়ত জিজ্ঞাসা করতে পারত। আজকাল ওদের দু'জনের মধ্যে কোথায় একটা চিড় খেয়ে গেছে। নীলাকে এড়াতে চায় যেন শান্তি, দেখা হলে হাসে কম, কথা বলে আরো কম।

'ভাত এখনো জুটছে' ইন্দ্রজিৎ বলে চলল, 'অবিশ্যি, কতদিন জুটবে বলতে পারিনে। এ-মাসের টাকা এখনও আসেনি বাড়ি থেকে, জানেন তো, আমি এখনো পরোপজীবী। এ-দিকে ডাক্তার বলছে ওষুধ খেতে, একটা টনিক, কোথায় পাই বলুন অত টাকা। ছেঁড়া জুতোর শোক না হয় নাই করলাম।'

'ওসব এখন ভাববেন না।' নীলা আশ্বাস দিল, 'বরং যে ক'দিন সেরে না উঠছেন, সে ক'টা দিন বই টই পড়ে কাটিয়ে দিন।'

'কোথায় বই', হতাশার শ্বাস ফেলল ইন্দ্রজিৎ, 'কেনবার টাকাই বা কোথায়।'

আঁচলের নিচের থেকে এতক্ষণে একটা বই বের করল নীলা, ঝকঝকে নতুন মলাট, উজ্জ্বল অক্ষরে নাম ছাপা একটা আধুনিকতম কাব্য সঙ্কলন।

'দেখি, দেখি', আগ্রহাতিশয্যে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইল ইন্দ্রজিৎ। কী দুষ্টমি খেলে গেল নীলার মনে, ইন্দ্রজিতের ঔৎসুক্যের বাড়াবাড়ি দেখে বইখানা লুকিয়ে ফেলতে চাইল ফের আঁচলে। ইন্দ্রজিৎ ততক্ষণ প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়েছে যেন ওর গায়ে; দুর্বল শরীর, সামলাতে পারেনি হয়ত। একটু পরে দুজনেই উঠে বসল যখন, নীলার আঁচল ইন্দ্রজিতের মুঠিতে, আলগা খোঁপা ভেঙে পড়েছে সহস্র ধারে, বিছানার ওপর বইখানা আধখোলা।

পাতা উল্টে ইন্দ্রজিৎ যেন আরো অবাক হয়ে গেল। 'আপনার বই? কবিতার বই আপনি কিনেছেন? আপনি কবিতা পড়েন?'

নীলা তখন বুঝি অল্প অল্প হাঁপাচ্ছে। শ্বাসউত্তাল বুক, চোখের মণি

দুইটি দৃষ্টি বিচিত্র, আসঙ্গাতুর। একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে থরথর কপট-কোপ গলায় বলল, 'দেখুন দেখি, কী করলেন আমার। হাতটা ছড়ে গেল!'

ততক্ষণ বইখানা খুলে চোখের সম্মুখে মেলে ধরেছে, ইন্দ্রজিৎ; কার হাত ছড়ে গেল কি না ভ্রূক্ষেপ নেই।

আস্তে আস্তে হাতখানা টেনে নিল নীলা। বলল, 'আমিই কিনেছি বইটা। আমি বুঝি কবিতা বুঝি না মনে করেছেন?' তারপর ইন্দ্রজিৎকে অবাক করে বইটা টেনে নিয়ে একটা কবিতা আস্তে আস্তে পড়েও শোনালো। বইটা মুড়ে রেখে নত স্বরে বললে, 'মনে হচ্ছে, আমাদের, এ যুগের কবিদের, বুঝতে পারছি ক্রমে ক্রমে।'

প্রত্যুত্তরে ইন্দ্রজিৎও একটা কবিতা পড়ে শোনাল। ক্রমে বেলা গড়িয়ে গেল, একটা কবিতা দুটো কথা, দুটো কথা একটা কবিতার সাঁকো পাড়ি দিয়ে ওরা পৌঁছেছে সন্ধ্যার প্রান্তে। একটু একটু করে মাদুর গুটানোর মতো শেষ রোদটুকুও নিজেকে কখন টেনে নিয়েছে ঘরের ভিজে মেজে থেকে; বাতাসে সামান্য হিমের আমেজ। সেদিন ইন্দ্রজিৎ ওকে স্পর্শ করেছিল; তপ্ত কপালে হাতখানা চেপে রেখে জিজ্ঞাসা করেছিল 'কত জ্বর', আজও তেমনি একটি উত্তপ্ত অনুভূতির জন্যে মনে মনে যেন তৃষিত হয়ে উঠল নীলা। একটু আগেও তো কাড়াকাড়ি হয়েছিল, সেই অসতর্ক ছোঁয়াছুঁয়িটুকুও যেন সূক্ষ্ম একটা প্রচ্ছদের মতো জড়িয়ে আছে গায়ে, চেতনায়। একটি তো শুধু মুহূর্ত, তবু যেন সারা শরীর বীণাযন্ত্রের মতো ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছিল, সারা মন হয়েছিল গান।

হঠাৎ বই মুড়ে রেখে ইন্দ্রজিৎ বললে, 'আর ভালো লাগছে না পড়তে। অসুন বরং—'

উৎকর্ণ হয়েছিল নীলা, ইন্দ্রজিৎ কী বলবে অনুভব দিয়ে শোনার জন্যে সরে বসেছিল হয়ত।

'আসুন বরং তাস খেলা যাক, কিংবা বাঘবন্দী।'

নীলা উঠে দাঁড়াল। শুকনো গলায় বললে, 'আমি তো তাস খেলতে জানি না।'

'বাঘবন্দী?'

'তাও না। আপনি বরং শুয়ে পড়ুন। দুর্বল শরীর, আবার অসুখ বেড়ে যাবে।'

ঘরে ফিরেও তার উত্তেজনা গেল না। কাকে বলবে এ লজ্জার কথা। কার কাছে স্বীকার করবে, এ ক'দিনের অক্লান্ত প্রস্তুতি একেবারে ব্যর্থ হয়ে গেছে। নিজেকে ইন্দ্রজিতের রুচির সঙ্গে মেলাবার দুরাশায় সাহিত্য নিয়ে এ ক'দিন মেতে ছিল নীলা। ভালো লাগেনি, তবু পড়েছে আধুনিক কাব্য, কলেজ লাইব্রেরী থেকে বই ধার করে কেবলি কবিতা পাঠ করেছে। যে টাকায় পাঠ্য পুস্তক কেনবার কথা, সেই টাকায় কিনেছে সংকলন। লজ্জাহীন চিত্ত-প্রসাধন। ইন্দ্রজিৎকে মুগ্ধ করবে, মাৎ করবে এই পণ।

কী বোকামি, কী বোকামি। আজ তো গিয়েও ছিল বড় গলায় বড়াই করতে। বড় গলায় আলোচনাতেও মেতেছিল। কে জানত ওর সঙ্গে বসে উঁচুদের কথা যখন বলছিল ইন্দ্রজিৎ তখন মনে মনে সে লালায়িত হয়ে হয়ে উঠেছিল আর একটি নারীর সান্নিধ্যের জন্যে, যে বাঘবন্দী খেলে, কিন্তু বন্দিনী হয় না, কবিতা নিয়ে বিন্দুমাত্রও মাথা ব্যথা নেই যার। কাব্যজিজ্ঞাসা সম্বন্ধে বড়ো বড়ো সমালোচকদের ভারি ভারি মত সদ্য সদ্য পড়ে এসে যখন উদ্ধৃত করছিল নীলা মনে মনে তখন ইন্দ্রজিৎ হাসছিল কিনা কে বলবে।

তবু পরাজয়টা মেনে নিতে চায় না নীলা। ইন্দ্রজিতের যে কত অভাব, তা তো সে জানে। এ সব রুচিবিকার আসে দৈন্য থেকে। ভালো করে খেতে পরতে পর্যন্ত পায় না লোকটা। কী একটা টনিকের নাম করছিল। নীলা ঠিক করলে সেই টনিকটা অন্তত ইন্দ্রজিৎকে কিনে দিতে হবে। শান্তির নেশা থেকে ওকে বাঁচাতে হবে।

নেশার কথায় হাসি এল নীলার। ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে তার নিজের নেশাও জমে উঠেছে মন্দ কী। বিনিদ্র চোখের কোণে জমে ওঠা ফোঁটা ফোঁটা রক্তের মত। পপ্‌লার পার্কের কথা মনে পড়ল। সৌম্য, মনন। কিন্তু মামির মত তাদের স্মৃতির আরকে ভিজিয়ে চিরকাল বাঁচিয়ে রেখে লাভ কী। যা ফুরিয়েছে তা ফুরিয়ে যাক। শরীর থাকবে আজকের ডাঙায়, মন গতকালের প্রবহমান অথৈ জলে, এই বিড়ম্বনার শেষ হোক।

শান্তি, শান্তি। যতবার নামটা উচ্চারণ করল নীলা ততবার ঘৃণার কলসী যেন উপছে পড়ল মনে। সে তো জানে শান্তি কী। ইন্দ্রজিৎ জানে না, তার দিকে আর ফিরেও তাকাবে না শান্তি। মণীন্দ্রকে জব্দ করবার আগ্রহে সে এখন ঘুরছে অন্য জ্যোতির্মণ্ডলে। থিয়েটারে সাকসেসফুল হয়েছে মণীন্দ্র, শান্তি হতে চাইছে সিনেমায়। কারা যেন আশ্বাস দিয়েছে শান্তিকে, চিত্রতারকা করে দেবে। প্রচুর খ্যাতি, প্রচুরতর পয়সা। আজকাল যাদের সঙ্গে ঘুরছে শান্তি, তাদেরও দু'একজনকে নীলাও দেখেছে কলেজে যেতে আসতে।

এবারে আর মিনমিনে কবি নয়। শক্তসমর্থ প্রায় মধ্যবয়সী লোকগুলো সব, পরণে মড়মড়ে ক্রীজ দেওয়া পাৎলুন কড়কড়ে ইস্ত্রি শার্ট, আর মা-কালীর জিভের মতো লক্‌লকে টাই। কখনো বা প্রজাপতি 'বো'। মণীন্দ্রের সঙ্গে সমানে পাল্লা দিচ্ছে শান্তি।

এই শান্তির হাত থেকে ইন্দ্রজিৎকে উদ্ধার করতে চাইছে নীলা। কিন্তু শান্তির মতো সর্বনাশ দিয়ে নয়, কল্যাণ দিয়ে। ওষুধ, পথ্য, স্নেহ জুগিয়ে।

পরদিন দাবার ছক গুটিয়ে প্রমথ পোদ্দার নিচে নেমেছে। নীলা পেছন থেকে ডাকল, 'শুনুন।'

ফিরে তাকালো প্রমথ। কপালের সহস্ররেখা সহস্রাধিক এক হল, বিচিত্র হেসে বলল, 'কী, বলো।'

এদিক ওদিক তাকিয়ে নীলা ওর হাতে একটা আংটি তুলে দিল। উত্তেজিত দ্রুত সুরে বলল, 'এইটে রেখে টাকা দিতে হবে আমায়। একটু দরকার

পড়েছে। পারবেন না?'

হাত বাড়িয়ে দিয়ে আংটিটা নিল প্রমথ। 'পারব। এখন তো টাকা নেই। কলেজ যাবার সময় টাকা নিয়ে যেয়ো, কেমন?'

'বেশ।' নীলা রাজী হল, 'আরেকটা কথা। আমার বাবাকে এ-সম্বন্ধে কিছু বলবেন না, এই অনুরোধ।'

'আচ্ছা।' ঘাড় নেড়ে রাস্তায় নেমে এল প্রমথ। আংটিটা সাবধানে লুকতে লাগল। হাসল আপন মনেই, এটা আবারো ফিরে এসেছে তার কাছে। বারে বারেই যায়, বারে বারেই ফেরে, অনুচ্চারিত কিন্তু অর্থপূর্ণ ভাষায় অনেক গোপন কাহিনী বলে পোদ্দারের কানে কানে। কিন্তু গোয়ালার গলির পালাগান জমেছে মন্দ না।

১৩

খুব সামান্য কারণেই অবিনাশকে অপমান করল নীলা, খুব সামান্য কারণেই তারও প্রায় দিন দশেক পরে দাদা-বৌদিরাও এ বাড়ি ছেড়ে চলে গেল।

কিন্তু গোয়ালার গলিতে চমকপ্রদ কিছু ঘটে না, এমনি ছোটখাটো ব্যাপার ছাড়া। একটুখানি ফিসফিস, একটু মুখ চাওয়া-চাউয়ি চাঞ্চল্য।

পরে অবশ্য নীলা ভেবেছে সেদিন শান্তিদির দরজার সমুখে অবিনাশকে চোরের মতো দাঁড়াতে দেখে চট করে মেজাজ হারানো ঠিক হয় নি। অবিনাশকে সে যে চিনেছিল এমন নয়। অবিনাশ অবিনাশোচিত কাজই করে-ছিলেন। পোষা কুকুরও মাঝে মাঝে ডাস্টবিন শুঁকতে যায়, মাঝে মাঝে শেকল একটু আলগা করে রাখতে হবে বৈকি।

কিন্তু অবিনাশ যদি নীলাকে দেখে থমকে না দাঁড়াতেন, না তাকাতেন ধরা-পড়া চোরের কবুলকরা চোখে, তা হলে হয়ত নীলা সামলাতে পারত। কিন্তু নীলার মুখোমুখি পড়ে গিয়ে ভদ্রলোক অমন হোঁচট খেলেন কেন।

'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'এই—এই একটু ওপরে, তোমাদের ওখানে। শুনলাম তুমি নেই, তাই আবার—'

'তাই আবার শান্তিদির দরজায় টোকা দিতে এসেছিলেন লাঠি দিয়ে?' প্রথমে অবিনাশের মুখের কথা কেড়ে নেয়ে বিষঢালা ঠাট্টার গলায় বলতে শুরু করেছিল, তারপর হঠাৎ ধৈর্য হারিয়ে বসল, 'কিন্তু আপনি এত মিছে কথা বলেন কেন, এমন প্রবৃত্তি কেন আপনার। আমি স্পষ্ট দেখলাম আপনি ও-ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন।'

নীলার গলা যত চড়ে, অবিনাশ তত গলা নামান। 'তুমি ভুল বুঝছ। মেয়েটি সিনেমায় নামতে চায়, আমার আবার অনেক স্টুডিওর সঙ্গে খাতির. তাই—'

'শুনুন কাকাবাবু,' নীলা সজ্ঞানে অবিনাশকে এই প্রথম পিতৃব্য সম্বোধন করলে, 'ও সব কৈফিয়তের প্রয়োজন নেই। আপনাকে চিনতে বাকি নেই,

এ-বাড়িতে আপনি আর আসবেন না।'

বিব্রতভাবে গালে হাত বোলাতে থাকলেন অবিনাশ। কোথায় বুঝি চালে একটু ভুল হয়ে গেছে। নইলে সাবধানে পা ফেলে ফেলে লাঠি আর বরাত ঠুকে ঠিকই তো এগোচ্ছিলেন। কবিরাজের পরামর্শে জোরালো সালসা ধরেছিলেন। সকালের বরাদ্দ একটি মুরগীর ডিমকে মাত্রা বাড়িয়ে চারটি করেছিলেন। তবু—

লাঠি ঠুকে ঠুকেই বেরিয়ে গেলেন অবিনাশ। মোটর আছে গলির বাইরে।

তিক্ততার সেই শুরু। দাদা বাড়ি ছাড়ল আরো প্রায় পক্ষকাল পরে।

সামান্য কারণ, প্রায় অকারণেই বৌদির সঙ্গে ঝগড়া হল। অনেক বেলা অবধি ঘুমিয়ে সেদিন দরজা খুলেছিল অমিতা। নিজেই কলেজের রান্না সেরে নেবার জন্যে হাতাখুন্তি নিয়ে নীলা বসেছিল।

রুমালে ফ্যাচ ফ্যাচ করে বার কয়েক নাক ঝেড়ে অমিতা বলেছিল, 'আমাকে এক কাপ চা খাওয়াবে, ও ভাই ঠাকুরঝি?'

'উনুন খালি নেই যে। কলেজের দেরি হয়ে যাচ্ছে।' শুকনো কাঠগলায় জবাব দিয়েছিল নীলা।

শুনে মুখখানা কালো হয়ে গেছে অমিতার। নিজেই কোথা থেকে কাগজ জড়ো করেছে শোবার ঘরে। তারপর তাতে আগুন দিয়ে নিজেই বুঝি জল গরম করতে গেছে।

আগুন ধরাতে গিয়ে কোথা থেকে কী হল, ডান হাতে একটা ফোসকা পড়ে গেল বৌয়ের। সেই থেকে অমিতা সেখানেই মেজেয় শুয়ে শুয়ে গড়াতে শুরু করল। কাগজ-পোড়া ছাই উড়ে উড়ে জড়িয়ে গেল শাড়িতে, অবিন্যস্ত কবরীতে, ক্লেশ-কুঞ্চিত কপালে। থেকে থেকে কাতরানির আর বিরাম নেই।

সারা সকাল উনুনের আঁচে এমনিই তেতেছিল, এ সব দেখে নীলার আর ধৈর্য রইল না। অমিতার ঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে তিক্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'আচ্ছা বৌদি, তুমি কী। এক কাপ চায়ের জলও কি গরম করতে জানো না। না কি জানো, তবু ইচ্ছে করেই এক একটা বিভ্রাট বাধিয়ে বসো, নিজের আনাড়িপনা জাহির করো। বড়লোক কাকার ভাইঝি, গরীবের ঘরে পড়েছ, চোখে আঙুল দিয়ে আমাদের দেখিয়ে দিতে চাও এ সব ছোট কাজ করবার অভ্যেস নেই, ননী দিয়ে তৈরি শরীর তোমার?'

এক মুহূর্ত অমিতার মুখ বুঝি নীরক্ত হয়ে গিয়েছিল, তারপরেই সোজা হয়ে বসেছিল। একটু পরে কোন কথা না বলে দরজায় দিয়েছিল খিল।

সারা দুপুর কিছু খায়নি বৌ। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে মা অনুনয় করেছেন, বৌ টলেনি, খোলেনি বন্ধ ঘরের খিল।

মা এসে নীলাকে বললেন, 'তুই মাপ চা, নীলা।'

পলকে নীলার চোখের মণি জ্বলে উঠল, 'মাপ চাইব? কী করেছি আমি।'

'কী করেছিস না করেছিস জানিনে বাবু। গেরস্ত ঘরের বৌ, সারাদুপুর না খেয়ে থাকবে, এতে অকল্যাণ হবে না?'

'কল্যাণ তোমার সংসারে যেন কতই আছে মা?' ঝাঁঝালো জবাব দিয়েছিল বটে নীলা, কিন্তু ওকে উঠতে হয়েছিল। রুদ্ধ দরজার সমুখে দাঁড়িয়ে নীলা বলল, 'আমি অন্যায় বলেছি বৌদি।'

সাড়া এল না। নীলা আবার ওর কথাটার পুনরাবৃত্তি করলে। এবার অমিতার অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে শোনা গেল, 'কিছু অন্যায় বলোনি ভাই, তোমার যা মনে হয়েছে বলেছ। আমার মনে করায় কার কী যায় আসে।'

'খাবে এসো।'

'মাপ করো ভাই। ইচ্ছে করছে না। শরীরটাও ভাল নেই।'

এবারে মা এগিয়ে এলেন, 'ওকে তুমি মাপ করো বৌমা। ছেলেমানুষ, কী বলতে কী বলেছে—'

এত যে রুচিবাগীশ মেয়ে অমিতা, মুহূর্তে তারও সমস্ত শালীনতাবোধ যেন খসে পড়ল। বিকৃত, হিংস্র গলায় বলে উঠল, 'ছেলেমানুষ! তবু যদি পাঁচজনের সঙ্গে ঢলাঢলি করতে না দেখতাম! বিয়ে দিলে ও তিন ছেলের মা হত জানেন?'

এত বড় অপমানেও মা কিছু মনে করলেন না। আরো বার দুই সাধাসাধি করালন বৌকে।

বিকেলে দেবব্রত এসে সব শুনল। অমিতা তাকে কী বললে, কে জানে। দেখা গেল দেবব্রত অফিসের পোষাক না ছেড়েই বেরিয়ে যাচ্ছে।

'কোথায় যাচ্ছিস, দেবু।'

'গাড়ি ডেকে আনি, মা। ওকে বাপের বাড়ি রেখে আসি।'

'বাপের বাড়ি রেখে আসবি? আমাদের কথা একবার শুনবিও না?'

'শোনবার তো কিছু নেই, মা', দেবব্রত গম্ভীর মুখে বললে, 'এ বাড়িতে ও যে মানিয়ে চলতে পারছে না, এতে তো কোন সন্দেহ নেই। রোজ রোজ অশান্তিরই সৃষ্টি হচ্ছে শুধু, তার চেয়ে ওকে রেখে আসি, সেই ভালো।'

'বৌয়ের কথা শুনে তুই—' মা কী বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু দেবব্রত তত-ক্ষণে চলে গেছে। মা নির্বাক হয়ে গেলেন। গাড়ি এল। যাবার সময় মাকে বুঝি একটা প্রণাম করল অমিতা। বাবা বাসায় ছিলেন না।

কারুর মুখে কোন কথা নেই। সবটাই যেন একটা মূকাভিনয়।

কালীঘাট কতক্ষণেরই বা পথ। দাদার কথায় মনে হয়েছিল বৌদিকে রেখে দাদা ফিরে আসবে। সন্ধ্যে হ'ল বাবা ফিরে এলেন। রাত হ'ল। আটটা, নটা, দশটা, দেবব্রত তবু ফিরল না। মা দাদার খাবার ঢাকা দিয়ে চুপ করে বসে আছেন। সদর রাস্তায় শেষ ট্রামটিও ঘণ্টা বাজিয়ে ফিরে গেল, দেবব্রতর দেখা নেই। মা বিনিদ্র চোখে বসে আছেন। গলিতে কারুর পায়ের শব্দ পেলেই উৎকর্ণ হয়ে উঠে বসছেন।

নীলা এক সময় বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'মিছিমিছি তুমি বসে আছ মা। দাদা আর ফিরবে না বুঝতে পারছ না?'

'আর ফিরবে না?' নিস্পন্দ, বিবর্ণ মুখে মা অর্ধস্ফুট স্বরে কথাটা

আবৃত্তি করতে পারলেন মাত্র।

উত্তেজিত, দ্রুতবেগে নীলা বলে গেল,—'একটা ছুতোয় অপেক্ষাতেই ওরা ছিল। এই দারিদ্র্য ওদের সহ্য হচ্ছিল না। পালিয়ে বাঁচল। এত বয়স হয়েছে তোমার আর এটুকু বুঝতে পারছ না?'

পরদিন সকালে মা বাবার কাছে গিয়ে বললেন, 'দেবু কাল রাত্তিরে ফেরেনি।'

গতকাল রেসে অনেক গেছে বাবার। দাদার ছক মিলিয়ে বসেছিলেন, প্রমথর অপেক্ষায়। চাল ঠিক করছিলেন মনে মনে। মুখ না তুলেই বললেন, 'গেল তো। আমি জানতুম যাবে।'

শেষের দিকে কতকটা দেবব্রতর আয়েই সংসার চলত। মা বললেন, 'কী হবে এবার।'

'কিছু হবে না, ঠিক চলে যাবে।' ছক থেকে মুখ তুলে বাবা অদ্ভুত চোখে হাসলেন, 'একটা বোড়ে কিংবা গজ গেল মাত্র। মাৎ এখনো হইনি।'

ঝাপসা ও বিবর্ণ ছায়া থেকে নীলা ইন্দ্রজিৎকে টেনে নিয়ে এল বাইরে। পার্কের বেঞ্চে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন দেখি, এখানে কত আলো।'

'বড়ো ধুলো যে।' ইন্দ্রজিৎ ক্ষীণকণ্ঠে আপত্তি করল, 'বড়ো বেশি লোক। বড়ো হট্টগোল।'

অসুখ থেকে উঠে সবে একটু চলাফেরা করতে শুরু করেছে, ইন্দ্রজিতের দুর্বলতা এখনো কাটেনি। 'বড়ো ধুলো, বড়ো আলো। চুপ করে এখানে বসে একটু সইয়ে নিন দেখি। এই আলো ধুলোও ভালো লাগবে।' নীলা বলতে চেয়েছিল। কিন্তু এত কথা মনে এলেও কি গুছিয়ে মুখে আসে? এই হট্টগোলের মধ্যেও বলিষ্ঠ যে সঙ্গীতের সুর আছে ইন্দ্রজিতের কানে তা বাজে না কেন। কী করে একে বোঝায় এই রিক্সা-ট্রাম-বাসের অনর্গল ঘর্ঘরের মধ্যে, ফিরিওয়ালার বিচিত্র বুলিতে, রোদের উত্তাপে আর ধুলির প্রলেপেই আছে জীবন। সঙ্কীর্ণ একতলা ঘরের ছায়াচ্ছন্ন প্রদোষ কড়িকাঠ গুণে গুণে জীবনকে ক্ষয়ে ফেলা যায়, পাওয়া যায় না।

হাত বাড়িয়ে সীজন ফুলের একটি পাপড়ি ছিঁড়ল ইন্দ্রজিৎ, একটা দুটো ঘাস দাঁতে কাটল। দু'পয়সার চীনে বাদাম ফরমাস করে বলল, 'কী জানি, বোধ হয় ভালো লাগাতে পারব।' হঠাৎ খুশিতে পা ছড়িয়ে দিয়ে বলল, 'মাঝে মাঝে এমন ছেলেমানুষের মতো হয়ে যেতে ইচ্ছে হয়!'

'আপনি তো ছেলেমানুষই।' নীলা বলল আস্তে আস্তে।

'ছেলেমানুষ!' ক্ষুব্ধশ্বাস ফেলে ইন্দ্রজিৎ বললে, 'সত্যিই যদি হতে পারতাম। মাঝে মাঝে ভেবে অবাক লাগে কী সব আশ্চর্য দিন পেছনে ফেলে এসেছি। জীবনে আর কখনো গাছে চড়ে ফল চুরি করব না, কিম্বা পুকুরে নেমে জল ছিটোব না, এ কথা ভাবতে কান্না পেয়ে যায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কত কিছুর শেষ হয়ে যায়।'

'বাকিও তো অনেক আছে।' নীলাও পা মেলে বসেছিল। দু'জনের আঙুলে ছোঁয়া লাগতেই জড়োসড়ো হয়ে সরে বসল। সংস্কারের রীতিই এই, মন যখন ফুটে ওঠে, ছড়াতে চায়, শরীর তখন বুজে আসে আপনা থেকে। পলো চাপা দিয়ে যেন পাখীকে উড়তে না দেওয়া।

দু' একটা চীনে বাদামের খোসা নীলার কোঁচড়ে পড়েছিল। হাতের টোকা দিয়ে সেগুলো উড়িয়ে দিল ইন্দ্রজিৎ।

বলল, 'ভিজে মাটি। এই দেখুন না, আমার হাত দু'টো ভিজে উঠেছে।'

'আমারো।' হাত দু'টি প্রসারিত করে দিল নীলা। অল্প রক্তজমা, শাদা দু'টি পেলব পাতা। ভিজে ঘাস আর কাদার আঘ্রাণ।

'চলুন যাই!'

'চলুন।' নীলার হাত ধরে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্রজিৎ। একটু যেন চমকাল। 'আপনার হাত এত গরম।'

অল্প হেসে নীলা যেন সমস্ত আড়ষ্টতাকে জয় করতে চাইল, 'কোথায় আর গরম। এ তো স্বাভাবিক', ইন্দ্রজিতের একখানা হিম হাত মুঠির মধ্যে নিয়ে বলল, 'সবাই তো আপনার মতো না, মৃত্যুকেই লক্ষ্য করে বসে আছেন। আমরা বাঁচতে চাই।'

'আমিও।' অর্ধস্ফুট গলায় ইন্দ্রজিৎ বললে, 'কী জানি, আমার মনে হচ্ছে আমিও বেঁচে যেতে পারি।'

গলির মুখে যখন পৌঁছল, তখনো দু'খানি হাত মুঠিবদ্ধ। পথের পাশে গরাদের আড়ালে একটি রেখাজীর্ণ বয়সহীন মুখে হাসি ফুটল ওরা টের পেল না। ছ'য়ের এফ বাড়িতে ঢুকল যখন, তখনও একতলার একখানা ঘরের ভেতর আরেকটি বিদ্রূপ-বাঁকা ঠোঁটের খাপ খুলে শাণিত হাসি নিষ্কাষিত হয়ে উঠল। সে শান্তি।

চাবি লাগিয়ে তালা খুলল ইন্দ্রজিৎ। নিস্তব্ধতার মধ্যে সেই শব্দও মনে হল অনেকখানি। একটা চামচিকে বেরিয়ে এল উড়তে উড়তে।

'ভেতরে আসবেন না?' জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও ইন্দ্রজিতের গলা কেঁপে গেল।

'চলুন।' নিজের জবাব নীলার নিজের কানেও পৌঁছল না।

কালি ঢাকা চিমনির আলোয় সারা ঘরের অন্ধকার গেল না। মেজের ফাটল থেকে হাজার হাত তুলে দিয়েছে স্যাঁতসেঁতে শীত। একটুখানি উত্তাপের জন্যে তৃষিত হাতখানা দিয়ে ইন্দ্রজিৎ তখনও স্পর্শ করে আছে নীলাকে। আগুনে পক্ষাহত আঙুলগুলো সেঁকে নেবে। সে স্পর্শে শুধু দেহ নয়, বরফপ্রাণও গলে গলে ঝরে।

পাঁচ আঙুলের সূক্ষ্মশীর্ষে পঞ্চপ্রদীপের শিখার মতো কাঁপতে থাকে।

আপনা থেকেই তেল ফুরোনো চিমনিটা নিবে গিয়েছিল। বাইরের রাত কুয়াশাকানা।

'কে?' ইন্দ্রজিতের চকিত প্রশ্নে নীলাও অলস, জড়িত চোখে তাকিয়ে

ছিল। দরজার পাশ থেকে একটা শাড়ির আঁচল এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে উঠল। অন্ধকারে গলা শোনা গেল, 'আমি। শান্তি।'

তারপর ছুটে পালিয়ে এসেছে নীলা। দু'হাতে মুখ ঢেকে, যে মুখে তখনো আর্দ্র স্পর্শের সরসতা, প্রশ্বাস তীব্রবহ।

লজ্জা? সে তো ছিলই। শান্তি দেখে ফেলেছে, সে তো শোধবোধ। কিন্তু শান্তিকে দেখেই ইন্দ্রজিৎ অত তাড়াতাড়ি যেখানে থেকে একটু আগেই একটা একটা করে কাঁটা তুলে খোঁপা খুলে দিয়েছিল, সেই মাথাটা কোল থেকে নামিয়ে দিল কেন? নীলা তো চেয়েছিল শান্তি দেখুক। কিছুই প্রায় দেখানো গেল না,—সাহসই হল না ইন্দ্রজিতের—সেও কি কম লজ্জা।

সারারাত নীলা সেদিন বিছানা থেকে মাথা তুলতে পারল না। কী যে যন্ত্রণা। কপালের দু'পাশের রগ টিপ টিপ করছে, চোখের দুটো পাতাতেই এত জ্বালা, এক করা যায় না। দেহানুভূতির ধূপ তো কখনই ছাই হয়ে গেছে, সুরভির স্মৃতির ধোঁয়াটুকু এখনো ছেয়ে আছে চেতনায়।

১৪

প্রথম যখন শুরু করেছিল শকুন্তলা, অসুবিধের কথা যে ভাবেনি এমন নয়। কিন্তু মেয়েদের কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া গেল এমন আশাতীত, ঝোঁকের মুখে ঝুঁকিটুকু নিতে বাধল না। অল্প টাকা, সদরে ঘর পাওয়া গেল কানা গলির পুরনো বাড়ি দেখেও দমেনি। আরো কটি মেয়ে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ভরসা বেড়েছে।

প্রথম মাসের সাফল্যও আশাতিরিক্ত হল বৈকি। ললিতা আসেনি, নাইবা আসুক। আছে স্টেলা, গীতা, অণিমা। শকুন্তলা নিজে। উদয়াস্ত খাটুনি। অস্তোদয় জাগরণ।

কিন্তু দ্বিতীয় মাসের গোড়া থেকে টানাটানি শুরু হল। প্রথম সপ্তাহটা প্রায় শকুন্তলাকে শুয়ে বসে কাটাতে হল। দু' একটা কল আসে কখনো কদাচিৎ। বাকি সময় হাই তোলা, ঝিমানো। আলসেমি ভাঙতে পেয়ালার পর পেয়ালা চা খাওয়া।

সীজন ডাল্।

দিনের শেষে হিসেব মেলাতে বসলে মাথা ঘোরে। আজ মাসের দশ তারিখ, এ পর্যন্ত যা এসেছে তাতে কোনক্রমে বাড়িভাড়াটা চলে যাবে। তার-পর? একা হলে শকুন্তলা এতটা ঘাবড়াত না, কিন্তু আরো তিনটে মেয়ে আছে তার দিকে চেয়ে। তারই ভালবাসায় এরা এক কথায় চাকরি ছেড়ে এসেছে। সে চাকরিতে ভবিষ্যৎ ছিল না। কিন্তু মাসান্তিক পাওনার নিশ্চয়তা ছিল।

পনেরো তারিখের পর শকুন্তলা বিচলিত হয়ে পড়ল। আর অপেক্ষা করা যায় না। এ ক'দিনে কল এসেছে মোট পাঁচটা। হবে গড়ে পঞ্চাশ ষাট টাকা।

প্রয়োজন পাঁচশোর। কত পরিকল্পনা ছিল, ছক ছিল মনে মনে সেবাসত্রের সম্প্রসারণের।

তৃতীয় সপ্তাহে অণিমা অসুখে পড়ল। সাধারণ সময় হলে শকুন্তলা এত ব্যস্ত হয়ে পড়ত না। কিন্তু বিপত্তিগুলোও যেন একটা সুপরিকল্পিত শৃঙ্খলার মতো আসে। প্রথমে মনে হয়েছিল সর্দিজ্বর। ম্যালেরিয়া ভ্রমে চিকিৎসা চলল আরো তিন চারদিন। আটদিনের দিন শকুন্তলা উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল। এ কদিন জ্বরের বিরাম হয়নি। যতদূর মনে হয় টাইফয়েড। শুশ্রূষার ত্রুটি নেই। শুশ্রূষার চেয়েও প্রয়োজন পথ্যের। একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার ডাকাও প্রয়োজন।

ডাল্ সীজন্, সেটা এক হিসাবে বাঁচোয়াও। তাই শকুন্তলা সর্বক্ষণ অণিমার পাশে বসতে পারছে। কিন্তু পরের মাসের গোড়াতে বাড়িভাড়া, বিজলী বিল্ চুকিয়ে যা হাতে থাকল, তাতে কায়ক্লেশে সাতদিন চলতে পারে।

ললিতার বন্ধু, মেডিকেল স্টুডেণ্টটি, একদিন এসে দেখে গেল। গম্ভীর মুখে হাসপাতালে স্থানান্তরিতের প্রশ্ন তুলল। অন্তত ভালো কোন ডাক্তার ডেকে ভালো রকম চিকিৎসা। ভালো ডাক্তার চেনা তো কতই ছিল, কিন্তু কে আসবে বিনা ভিজিটে। যখন বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছিল, তখন সকলেই তো বাধা দিয়েছিলেন। আজ আবার তাদের দ্বারস্থ হতে শকুন্তলার মাথা কাটা যাবে।

পরের দিন ললিতা এসে একটু আশা দিয়ে গেল। মেডিকেল স্টুডেণ্ট অরবিন্দ আরো কটি বন্ধুর কাছ থেকে কিছু টাকা সংগ্রহ করেছে। সেবা-সত্রের সাহায্য নয়, অণিমার চিকিৎসার নামে। ডাঃ উপাধ্যায়ও একদিন এসে দেখে যেতে রাজি হয়েছেন।

দেখতে এসে ডাঃ উপাধ্যায় আরো কিছু অযাচিত উপদেশের হরির লুঠ দিলেন। বরাবরের মতোই শান্ত, সৌম্য মূর্তি এই কটি হঠকারিণীর অবাধ্যতার জন্যে তিনি বিব্রত বিরক্ত নন। মাথার কাঁচাপাকা মেশানো চুলের মতো মুখে ইংরিজি বাঙলা মেশানো খিচুড়ি বুলি। ভালো করে দেখলেন, প্রেস্ক্রিপশনও লিখলেন।

শকুন্তলা অবাক হল, যখন বাড়ি ফিরে গিয়ে ডঃ উপাধ্যায় দু'খানা দশ-টাকার নোট পাঠিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে একখানা চিঠি। শকুন্তলা যেমনই ব্যবহার করে থাকুক এখনো ওদের ক'জনকে আগের মতোই স্নেহ করেন ডাক্তার উপাধ্যায়। অহরহ কল্যাণ কামনা করেন। ওদের বিদ্রোহে যেমন আঘাত পেয়েছিলেন, আজকের দুরবস্থায় তেমনি ব্যথা পাচ্ছেন। তাঁর সামর্থ্য কম, তাই এই যৎকিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য। শকুন্তলা যেন—

ছত্রে ছত্রে রোমাঞ্চ-কণ্টকিত দরদ, উৎকণ্ঠিত সহানুভূতি। তবু শকুন্তলার মনে হল কোথায় একটা পরিতৃপ্তি প্রচ্ছন্ন রয়েছে যেন। এই কটি অবাধ্য বোহিসিব মেয়ে তাঁর কথামতো না চলেই যে বিড়ম্বিত হয়ে পড়েছে, ডাঃ

উপাধ্যায় এর মধ্যেও একটা স্থূল আনন্দ পেয়েছেন। পাকা চুলকে সেলাম না দেওয়ার সেলামি গোণো এবার।

চিঠিখানা পড়ে ছুঁড়ে ফেলে দিল শকুন্তলা! কিন্তু টাকাটাও যদি ওই সঙ্গে ছুঁড়ে ফেলা যেত। কিন্তু টাকাটা কুড়িয়ে নিতেই হল মাথা হেঁট করে, আঁচলেও বাঁধতে হল। দৈন্য এমনই। শকুন্তলার বার বার ধিক্কার দিতে হল নিজেকে।

ডাকপিওন কখন ছুঁড়ে দিয়ে গিয়েছিল কেউ টের পায়নি। পরদিন সকালে ঝি ঘর ঝাঁট দিতে গিয়ে দরজার কোণে কুড়িয়ে পেল। এনে দিল শকুন্তলাকে।

মোড়ক করা একখানা পত্রিকা। যতদূর মনে হয় সাপ্তাহিক। কদর্য ছাপা, কদর্য কাগজ, পড়তে গিয়ে দেখল কদর্য ভাষা।

কিন্তু পাঠাল কে। বেছে বেছে সেবাসত্রেই বা পাঠাল কেন। এ ধরনের কাগজ শকুন্তলা এর আগে কখনো পড়েনি, তবে নাম জানত। রাস্তার মোড়ে, ট্রামের জানালায় এই কাগজ হাতে নিয়ে হকারদের তারস্বরে চেঁচাতে দেখেছে।

প্রথমে কৌতূহলের সঙ্গে পাতা ওল্টাতে শুরু করেছিল, তারপর একটা পাতায় এসে শকুন্তলার চোখ আটকে গেল। শিরোনামা দেখেই কান দু'টি গরম হয়ে উঠেছিল, দু'চার লাইন পড়তে না পড়তেই ঠোঁট দু'টি ঈষদ্ভিন্ন হল, নিশ্বাস পড়তে লাগল জোরে জোরে।

বেনামে কে একজন একটা নার্সেস হোমের কুৎসা গেয়েছে। কতকটা গল্পচ্ছলে লেখা, নাম-ধাম আছে আভাসে। বলা বাহুল্য, লক্ষ্য শকুন্তলা। স্বামী-পরিত্যক্তা একটি দুশ্চরিত্রা মেয়ে আরো ক'জন মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে এসে কলকাতার বুকে বসে সেবাধামের নলচে আড়াল দিয়ে যথেচ্ছাচার চালিয়ে যাচ্ছে, তারই সালঙ্কার, সটিপ্পনী, সবিস্তর বর্ণনা। কাল্পনিক কতকগুলো কাহিনীও জুড়ে দেওয়া আছে। উপসংহারে পুলিসের কর্তব্যবোধ, জনসাধারণের নাগরিক দায়িত্বের প্রতি আবেদন আছে। এই ব্যভিচারের পীঠস্থানের আসল নামধাম আছে লেখকের কাছে। প্রয়োজন হলে সবই প্রকাশ করা হবে আস্তে আস্তে। অনেক তথ্য আছে, সাক্ষ্য, প্রমাণ, মালমশলা, কেচ্ছা। পাঠক, সবুর।

পড়ল সবাই। গীতা পড়ল শকুন্তলার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। অণিমা বিছানায় শুয়ে শুয়ে। গীতার মুখ রক্তিম হয়ে উঠেছিল, অণিমা শাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।—'কে লিখলে শকুন্তলাদি। কার এই কাজ।'

'কী জানি কার।'

কাগজটাকে কুটি কুটি করে ছিঁড়ল শকুন্তলা। কার কাজ সে জানে বৈকি। অন্তত বুঝতে পেরেছে। বনমালী ছাড়া এমন বিষ আর কেউ ঢালতে জানে না। ওর দেহের সমস্ত দূষিত বিষ জমা হয়েছে গিয়ে কলমে। খিস্তি সাপ্তাহিক। বনমালী মিডিয়াম বেছে নিয়েছে মন্দ না।

কলঙ্কের ভয় ছিল না, কিন্তু মাসের শেষে শকুন্তলা আরো হতাশ হয়ে পড়ল। সদর দরজায় কড়া এখন কদাচিৎ নড়ে। সেই সাপ্তাহিকখানার আরো কয়েকটা সংখ্যা বেরিয়েছে। ছদ্মনামা লেখক আরো দু'তিন কিস্তি কেচ্ছা গেয়েছে। নাম এখনও প্রকাশ করেনি, কিন্তু তার লক্ষ্য যে এই কিনু গোয়ালার গলির সেবাসত্র, সেটা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

প্রথমে শকুন্তলা উপেক্ষা করবে ভেবেছিল। কিন্তু কে জানত, দু-পয়সা দামের খিস্তি কাগজের প্রভাব এত, এত জনপ্রিয়তা। রাস্তায় বেরুলেই শকুন্তলা আজকাল টের পায়, অনেকেই, অন্তত এ-গলির সবাই, সকৌতুকে ওর দিকে চেয়ে আছে। এরাও পড়েছে, কী করে জানতে পেরেছে কিনু মুদির বাই-লেনের সেবিকালয় আসলে কিনু গোয়ালার গলির সেবাসত্রই। চাপা হাসি দেখতে পেয়েছে শকুন্তলা সবার চোখে-চোখে, ফিস ফিস আলাপ শুনতে পেয়েছে। একটি সদ্যজাতককে অঙ্কুরে নষ্ট করার জন্যে অসংখ্য হাত এগিয়ে এসেছে।

ডাকে তো একখানা করে কাগজ নিয়মিত আসছেই, আরো নানারকম উৎপাত শুরু হল। ডাঃ উপাধ্যায় ওই সাপ্তাহিক থেকেই একটা কাটিং পাঠিয়ে দিলেন একবার ঃ এসব কী শুনছি।

সন্ধ্যা হতে না হতেই সদরে, খিড়কিতে, জানালায় শিস শোনা যেতে লাগল। পাড়ার বে-পাড়ার ইয়ারেরা দল বেঁধে জটলা করছে আশে পাশে, কাছে-দূরে, গ্যাসের আলোর ঠিক নিচের অন্ধকারে। কিছু বলবার উপায় নেই।

শেষ রাতে কারা বাইরের দেয়ালে সাপ্তাহিকখানার আধুনিকতম সংখ্যাটি এঁটে দিয়ে গেছে, সেটা না হয় সকালে উঠেই ছিঁড়ে ফেলা গেল ; মোড়ে যে সাইনবোর্ডটায় ছিল সেবাসত্রের নাম আর অঙ্গুলিসংকেত, তার ওপর আলকাতরা দিয়ে বড়ো বড়ো হরফে অনুচ্চার্য, অশ্লীল একটা মন্তব্য করে রেখেছে ; সাইনবোর্ডটা সরিয়ে সেটাও না হয় লোচনের আড়াল করা গেল, কিন্তু সময় অসময়ে জানলা তাক করে ঢিল ছোঁড়া বন্ধ করবে কে।

তবু বেরুতে হয়। মান খুইয়ে, লজ্জা বিসর্জন দিয়ে। কানে তুলো, পিঠে কুলো।

ললিতার সঙ্গে একদিন রাস্তায়ই দেখা হয়ে গেল। শকুন্তলাকে দেখেই ললিতা যে পাশ কাটাতে চেষ্টা করেছিল, সেটুকুও ধরে ফেলতে দেরি হয় না। শকুন্তলা ওর একখানা হাত ধরে ফেলে বললে, 'পালাতে গিয়ে রাস্তায় নামতে যাচ্ছিলি ললিতা, কী করবি বল, ফুটপাতটা যে এখানে বড্ডোই সরু। কিন্তু ওদিক থেকে একটা লরি আসছিল দেখতে পাসনি বুঝি। আরেকটু হলেই গাড়ি-চাপা পড়তিস যে। না কি, লরির চেয়ে আমাকে তোর বেশি ভয় ?'

ললিতা অপ্রস্তুত হল এবং শকুন্তলাকে সে যে মোটেই এড়াতে চায়নি সেটা প্রমাণ করবার জন্যেই বুঝি একটানা অনেক কথা বলে গেল। 'তুমি খালি

ঠাট্টাই করো শকুন্তলাদি, আমি আবার পালাতে গেলাম কখন।'

ওর কথার তোড়ে বাধা দিয়ে শকুন্তলা বললে, 'তুই আজকাল যে যাওরা-আসা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিস ললিতা।'

ললিতা প্রথমে অস্বীকার করতে চাইল, ঢোক গিলল বার কয়েক। শেষে ওকে স্বীকার করতে হল। সেবাসত্রে আসা-যাওয়াতে অরবিন্দর কড়া মানা আছে। ললিতা এখন শুধু নার্সমাত্র নয়, আজ বাদে কাল ডাক্তার হবে এমন একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের মনোনীতা! শহরশুদ্ধ ঢি ঢি পড়ে গেছে, এমন বাসায় গিয়ে আড্ডা দিতে অতই শখ হয়ে থাকে যদি, তবে সে যেন অরবিন্দর ত্রিসীমায় না আসে। দুটোর মধ্যে একটাকে বেছে নিক।

বলা বাহুল্য, বেছে নিতে ললিতার ভুল হয়নি। শকুন্তলা সব শুনে বললে, 'হুঁ। তোদের বিয়ে কবে হচ্ছে ললিতা?'

'সে সব এখনো কিছু ঠিক হয়নি। এই তো সেদিন পাশ করেছে অরবিন্দ, হাসপাতালে থাকতে হবে আরো কিছুকাল।'

'ততদিন বসে থাকবি?'

ততদিন। বিয়েটা আগেই সুযোগমতো, শুভলগ্নে হয়ে যেতে পারে! কলকাতায় তো প্র্যাকটিস করবে না অরবিন্দ। এখানে ভিড়। চলে যাবে মফঃস্বলে। সেখানে প্রতিযোগিতা কম, লক্ষ্মী স্বয়ং উপযাচিকা। অনেক দূরে চলে যাবে ওরা, পশ্চিমে ছোট্ট পরিচ্ছন্ন শহর, সুন্দর একটি বাংলো, শহর, সুন্দর একটি বাংলো, সেই কুটীররাণী ললিতা। সবই তো ঠিক হয়েই আছে, কবে নোটিস দেবে ললিতা, কবে চাকরি ছেড়ে দেবে। শুধু একটা বছরের অপেক্ষা। আসন্ন সুখের কল্পনাতেই ললিতার মুখখানা টসটস করছে।

পর পর আরো দুটো ঘটনায় শকুন্তলা আরো বিচলিত হয়ে পড়ল।

সন্ধ্যার সামান্য বাকি, সেদিন সুবেশ একজন লোক একেবারে ওপরে চলে এসেছে। সদর দরজা খোলাই ছিল বুঝি। গীতার সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি দেখা হয়েছে।

গীতাকে নমস্কার করে বলেছে, 'তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। এখনি একবার যেতে হবে যে।'

মিহি কোঁচানো ধুতি, রেশমি জামা। সম্ভ্রান্ত চেহারা।

'জরুরি কেস বুঝি?'

'জরুরিই।' আলো তখনো জ্বলেনি, বোঝা যায়নি লোকটা সামান্য একটু হেসেছিল কিনা!

অণিমা তখনও ভালো করে সারেনি, শকুন্তলাও বাসায় ছিল না। গীতা ইতস্তত করছিল, যাবে কিনা। কিন্তু সমস্ত মাসের মধ্যে এই প্রথম এবং একমাত্র কল এসেছে, ফিরিয়ে দিতেও মন সার দেয় না। মনে মনে গীতা ভাবছিল, এর মধ্যে শকুন্তলাদি যদি এসে পড়ে সে বেঁচে যায়। এদিকে লোকটা বলছে, কেসটা জরুরি। কতক্ষণই বা বসিয়ে রাখা যায়।

বললে, 'এমারজেন্সি কেসে বেশি টাকা লাগে কিন্তু।'

বেশি ? কত বেশি ? পকেট থেকে লোকটা তাড়া তাড়া নোট বার করেছে, দশ টাকার। কে জানে হয়ত দু-চারটে একশো টাকারও ছিল। চোখ দুটো গীতার চকচক করে উঠেছে, একসঙ্গে এত টাকা দেখলে এই প্রথম। টাকাই দেখলে কতদিন পর। লোভ সামলাতে পারল না। বলল, 'কিছু অ্যাডভান্স দিতে হবে।'

'কত ?'

'পঁচিশ টাকা।' বলতে না বলতেই লোকটা যেভাবে তিনখানা দশ টাকার নোট এগিয়ে দিয়েছে, তাতে গীতা মনে মনে আপশোস করেছে, আরো কিছু বাড়িয়ে চাইল না কেন। লোকটার যা গরজ কেসটা কত জরুরি না জানি।

শেষ পর্যন্ত শকুন্তলার নামে একটা ছোট চিঠি রেখে গীতা বেরিয়ে পড়ল। নোট তিনখানা গেঁথে রাখল চিঠির সঙ্গে। শকুন্তলাদি বাসায় ফিরে একেবারে অবাক হয়ে যাবে। চিঠি পড়ে না হোক টাকা পেয়ে।

বাড়ি ফিরে চিঠি পেয়ে শকুন্তলা প্রথমে কিছুই বুঝতে পারেনি। তবু মনে একটু অস্বস্তি হয়েছে। সে থাকলে গীতাকে এভাবে একা ছেড়ে দিত না ঠিক।

দশটা, এগারোটা, বারোটা। অনেকক্ষণ গীতার জন্যে অপেক্ষা করে, শেষে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল ঠিক নেই। গীতা এসে যখন কড়া নাড়াল কে জানে তখন একটা না দুটো না তিনটে।

কিন্তু এ কী বিশৃঙ্খল চেহারা গীতার, আজ বিকেলে কি চুল বাঁধতেও ভুলে গিয়েছিল। শুকনো গালে হাড় যেখানটা উঁচু সেখানটা কী বিবর্ণ। চোখ দুটিতে এমন অপরিসীম ক্লান্তি, তবু মণি দুটো এত প্রজ্বলন্ত। যাবার সময় যদিও গীতা একখানা শাড়ি ভাঁজ ভেঙে পরে গিয়েছিল, এখন সেটা শতবার ব্যবহার মনে হচ্ছে কেন।

চট করে আলো নিভিয়ে দিয়েছিল গীতা। আড়ষ্ট গলায় যদিও বলেছিল, 'এখন কিছু জিজ্ঞাসা করো না শকুন্তলাদি, কাল সব বলব', কিন্তু বলতে বাকি রাখেনি কিছুই। কখনো থেমে থেমে কখনো অস্বাভাবিক, উচ্ছ্বসিত দ্রুততায়।

গীতার কাটা-কাটা কথাগুলো জোড়া দিলে যা দাঁড়ায়, তা এই ঃ

বড়ো রাস্তায় মোটর দাঁড় করানো ছিল। লোকটা ইঙ্গিতে তাকে উঠতে বলে। তারপর অনেক ঘুরে, এঁকেবেঁকে যেখানে এসে গাড়িটা দাঁড়িয়েছে, গীতা অনুমানে বুঝেছে সেটা শহরতলী।

প্রকাণ্ড সেই বাড়িটাতে মহলের পর মহল, সিঁড়ি আর বারান্দার শেষ কই ; দেয়ালে দেয়ালে তৈলচিত্রের সংখ্যা নেই, অফুরন্ত কিউরিও সংগ্রহ। মেহগনি পালঙ্ক, মেজেয় ফরাস ; সম্পূর্ণ দেহের ছায়া পড়ে, এমন আয়না।

'রোগী, রোগী কই ?' এমনই স্তম্ভিত পরিবেশ, আপনা থেকেই গীতার গলা কেঁপে গেছে। 'কার অসুখ।'

'আমার', এতক্ষণে লোকটা তরল গলায় হেসে উঠেছে। পালঙ্কে বসে, তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বলেছে, 'কেন চেহারা দেখে মালুম হচ্ছে না, একেবারে জর্জরিত হয়ে আছি? স্পর্শেতে বুঝিবে তা কি'—বলতে বলতে গীতার একখানা হাত ওর বুকের ওপর রেখেছে।

ছিটকে সরে যেতে চেষ্টা করেছে গীতা। গলায় কথা ফোটেনি, তবু বলতে চেষ্টা করেছে, ছেড়ে দিন। পেঁছে দিয়ে আসুন আমায়। যা ভেবেছেন, তা নই। ইত্যাদি।

পেঁছে দিয়ে আসব বৈকি। দক্ষিণা ন্যায্য দেব; কিন্তু কী ব্যাপার বলো দেখি। দাম বাড়াতে চাও?

আপনি ভুল করেছেন।

ভুল করেছি শহর শুদ্ধ লোক জানে, তোমরা কী, আর ভুল করলাম একা আমি। একখানা কাগজ ওর চোখের সুমুখে খুলে দিয়ে লোকটা বলেছে, তবে এই ছাপার অক্ষরগুলোও ভুল করেছে বলো। কাগজে কাগজে তোমাদের কীর্তি। আগে থেকেই দরদস্তুর ঠিক করে তোমাকে নিয়ে আসতে পারতাম, কিন্তু এ ভাবে না আনলে কী আর অ্যাভডেঞ্চার হত। রস ফিকে হয়ে যেত। মজা জমানোর জন্যে সামান্য একটু লুকোচুরি করেছি, সেজন্যে রাগ করে থেকো না মাইরি।

গীতার গলা শুকিয়ে গিয়েছিল। 'একগ্লাস জল দিন', বলল কোনক্রমে।

জল কেন, ডাবের জল দিচ্ছি। আরো ঠাণ্ডা, আরো মিঠে। সত্যি সত্যিই লোকটা ডাবের জল এনে দিল। কী বলব শকুন্তলাদি, আমারো তেষ্টা পেয়েছিল, অত চেয়ে দেখিনি। ডাবের জল একটু বিস্বাদই হয়। দু চুমুক খেতেই গলা জ্বালা করে উঠল, মাথা ঘুরতে লাগল। পরে বুঝতে পেরেছি শকুন্তলাদি, ডাবের জলের সঙ্গে ব্রাণ্ডি কিম্বা ওই জাতীয় একটা কিছু মেশানো ছিল বোধ হয়।

তারপর?

তারপর আবার কী। লোকটা নিজে গাড়ি করে পেঁছে দিয়ে গেল এই তো একটুখানি আগে। গলির রাস্তাটুকু আমি একাই চলে আসতে পারলাম।

একটু চুপ করে গীতা আবার বলল, 'আমি কিন্তু টাকা না নিয়ে আসিনি শকুন্তলাদি। কিন্তু তুমি তো আমাকে এবার তাড়িয়ে দেবে না?'

মুখ দিয়ে তখনো অল্প অল্প গন্ধ আসছিল গীতার। শকুন্তলা ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলল, 'তুই এবার ঘুমো দেখি।'

দ্বিতীয় ঘটনাটা ঘটল আরো দিন পাঁচেক পর।

১৫

গলাবন্ধ শেরোয়ানি, সব কটা বোতাম আঁটা। চুড়িদার পাজামা। একটুখানি

গোঁফ, কেবল সযত্নে বর্ধিত নয়, সযত্নে ছাঁটাও। প্রথমে শকুন্তলা অবাঙালী-বোধে হিন্দিতেই কথা শুরু করেছিল, দু-একটা কথার আদান-প্রদান হতেই ভ্রম ভাঙল।

আগন্তুক বললেন, 'আমি বাঙালী, পরিচ্ছদটা বিজনেসের, তাছাড়া সর্ব-ভারতীয়।'

'কী কেস?' শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করল।

'ডেলিভারি।'

'বেশ, কবে যেতে হবে বলুন।'

আগন্তুক একটু কাশলেন। 'আরেকটু কথা আছে। আমার স্ত্রী, মানে যাঁর কেস, খুব ছেলেমানুষ, ডেলিকেট হেল্‌থ্‌—'

শকুন্তলা হাসল। 'সেজন্যে ভাবছেন কেন। কোন একজন ভালো ডাক্তারও না হয় নেবেন।'

'ডাক্তার?' অন্যমনস্ক গলায় আগন্তুককে বলতে শোনা গেল, 'হ্যাঁ, ডাক্তার তো একজন নিতে হবেই। তা হলে আমি বিকেলে আমার ওয়াইফকে নিয়ে নিয়ে আসবে—'

'তাই আসবেন।'

হলদে কৃশ মুখ, সিঁড়ি দিয়ে উঠতে পারে না, এমন রোগা। ভদ্রলোক বিকেলের দিকে স্ত্রীকে নিয়ে যখন এলেন, তখনই শকুন্তলার মনে হয়েছিল। মেয়েটি বসেই এক গ্লাস জল চাইল। ওর যদি বয়স হয়ে থাকে, সে শুধু দেহের কোন কোন রেখার পূর্ণতায় বা পরিণতিতে, মুখখানায় এখনো ছেলেমানুষি।

'এই আমার স্ত্রী।' ভদ্রলোক বললেন, 'একটু বাইরে আসুন আপনার সঙ্গে কথা আছে।'

বাইরে এসে শকুন্তলা বলল, 'এখন তো বেশ দেরি আছে, মনে হচ্ছে। আপনি এখনই ঘাবড়ে গেছেন কেন। ডেলিভারির সময় খবর দেবেন, যাব।'

কাঁচুমাচু মুখে ভদ্রলোক সবিনয়ে যা বললেন, শুনে শকুন্তলা স্তম্ভিত হয়ে গেল। ডেলিভারির জন্যে ভদ্রলোক আসেন নি, এসেছেন ডেলিভারি বন্ধ করাতে।

'সে কী!'

অপ্রস্তুতভাব ঢাকতে ভদ্রলোক একটা সিগারেট ধরালেন। 'আমার স্ত্রীর এই ডেলিকট হেল্‌থ, ও নিশ্চয়ই মরে যাবে। পারবেন না আপনি একটা ব্যবস্থা করতে? নিশ্চয়ই পারবেন। ও না হয় কিছুদিন এখানেই রইল—'

'ডেলিকেট হেল্‌থের জন্য বেশি ব্যস্ত হবেন না। মেয়েদের হেল্‌থ্‌ এ-সব ব্যাপারে প্রায়ই ডিসেপটিভ হয়ে থাকে। সব ভালো মতো হয়ে যাবে দেখবেন।'

আরো কিছুক্ষণ কথা কাটাকাটি চলল। ভদ্রলোক যত অনুনয় করেন, শকুন্তলা কঠিন হয় তত। শেষে ভদ্রলোক আসল কথাটা ব্যক্ত করলেন। 'কিন্তু

আমরা যে ছেলে পুলে চাই না, মিস সরকার। আমাদের দু'জনের কেউই না।'

'আপনার স্ত্রীও না ?'

'না, মিস্ সরকার। · আমার স্ত্রী-ই না কিনা। এবার বুঝেছেন ?'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শকুন্তলা বললে, 'না। আপনি ভুল করছেন এসব কাজ আমি করি না ;'

'বুঝেছি', ভদ্রলোক বললেন, 'কিছু দাঁও মেরে নিতে চান। বেশ কত লাগবে বলুন, ও আপনাদের এখানেই রইল, একটা চেক লিখে দিচ্ছি।'

'না।' শকুন্তলা দৃঢ়স্বরে বললে।

'একটু দয়া করুন। আমার সুনাম—

বাধা দিয়ে শকুন্তলা বলল, 'এ-সব ব্যাপারের জন্যে অন্য জায়গা আছে। আপনি ভুল ঠিকানায় এসেছেন। এমন নোংরা কাজ করব বলে সেবাসত্র খুলিনি।'

'ভুল ঠিকানায় এসেছি ?' ভদ্রলোক পকেট থেকে এক টুকরো কাগজ বার করে বললেন. 'এই দেখুন পরিষ্কার হরফে নাম ঠিকানা লেখা। দেখুন তো চিনতে পারেন কিনা হাতের লেখা।'

চিনতে পারল। এতদিন দেখেনি, তবু বনমালী সরকারের হাতের লেখা চিনতে শকুন্তলার দেরি হল না। তবে ঠিকানা দিয়ে বনমালীই পাঠিয়েছে লোকটাকে, শকুন্তলার কাছে। শকুন্তলা টাকা খেয়ে এই সব কাজ করে বলে বেড়াচ্ছে। সমস্ত সত্তা ঘৃণায় কুণ্ঠিত হয়ে উঠল, কিন্তু করবার কিছু ছিল না।

স্টেলা সব শুনে অসন্তুষ্ট হল। 'রাজি হলে না কেন ? অন্তত হাজার টাকা পাওয়া যেত।'

'সম্ভবত আরো বেশি।' শকুন্তলা বললে, 'কিন্তু পাপ-পুণ্য না মানলেও, ন্যায়-অন্যায় মানি স্টেলা। আর তুমি যতই বিলিতি নাম নিয়ে ঘুরে বেড়াও, এ-সংস্কার তোমারও আছে। তুমিও এ-দেশেরই মেয়ে।'

'তা হোক ; তবু এই ক'টা টাকা পেলে নতুন করে শুরু করা যেত। শুধু ন্যায় আঁকড়ে থেকেই বা তোমার কী লাভ হল শকুন্তলাদি। সবাই তো ছি ছি করছে।'

'করুক।' শকুন্তলা বললে। 'আমি পারব না।'

প্রতিশোধ তুলছে বনমালী সরকার।

কিন্তু কিছুতেই শকুন্তলা বিব্রত হত না, যদি এই ক'টি মেয়ের ভবিষ্যৎও তার ওপর না থাকত। অথচ যাদের ভরসায় করা, সেই মেয়েদের মধ্যেও দুর্বলতার লক্ষণ দেখতে পেয়েছে বলেই শকুন্তলার এই দুর্ভাবনা। আজ কদিন থেকেই গীতার মুখ ভার, স্টেলা বাইরে বাইরে ঘুরছে ; অণিমা সবে অসুখ থেকে উঠেছে, এখনও বাইরে বেরুতে পারে না, সে সবার মুখের দিকে তাকাচ্ছে শুধু, মনে মনে উসখুস করছে। প্রশ্ন এই, আর কতকাল। বৈরী পৃথিবীর যৌথ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে কতদিন আত্মরক্ষা করবে এই ক'টি সম্বলহীন মেয়ে।

আর কিছু না থাক, এ-কাজে অন্তত ফিটফাট পোষাক চাই, শিরস্ত্রাণ চাই ধবধবে। টাকা না পেয়ে ধোবা কাপড় কাচা বন্ধ করেছে কতদিনই, নিজেদের হাতে কাচতে গেলেও আজকাল এখানে ওখানে ফস করে ছেঁড়ে।

বিকেলে সেদিন আর কেউ ছিল না, শুধু অণিমা আর শকুন্তলা। অণিমা বলে উঠল 'তুমি রাজি হলে না কেন শকুন্তলাদি।'

হঠাৎ শকুন্তলার দু'চোখ জলে ভরে গেল, 'তুই—তুইও এ-কথা বল্‌লি অণিমা।'

মাথা নিচু করে বিছানার চাদরে দাগ কাটতে কাটতে অণিমা বললে, 'ওরাও বলছিল, গীতা আর স্টেলা। জানো শকুন্তলাদি স্টেলা আর এখানে থাকবে না।'

'থাকবে না?'

'না। ওর দূর সম্পর্কের কে এক কাজিন এতদিন ছিল বিদেশে। সে ফিরে এসেছে, স্টেলার সঙ্গে নাকি অনেকদিন আগে থেকেই বিয়ের সব ঠিক হয়েছিল।'

'জানি।' শকুন্তলা বললে, 'একে একে সবাই যাবে।'

মোজা প্রথমে যেমন ফাটে গোড়ালিতে, তারপর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে, নীলা বুঝতে পেরেছে তারও হয়েছে তেমনি। প্রথমে ছিল কৌতূহল, ক্রমশ করুণা, এখন—কে জানে তার নাম কি। একেবারে ব্যর্থ হলে, বুঝি এত অস্বস্তি ছিল না। কিন্তু এ এক অদ্ভুত ক্ষত, বাড়ে না, সারেও না, শিরা থেকে শিরায় শোণিতের কণিকায় কণিকায় জ্বালার মতো ছড়ায়।

টনিক ওষুধটা নিয়ে যেদিন ইন্দ্রজিতের ঘরে গিয়েছিল, সেদিন ইন্দ্রজিৎ বিছানায় উঠে বসেছিল। প্রথমে নিতে চায়নি, বলেছিল, 'আমার জন্যে এ-সব কেন আবার কিনতে গেলেন।'

'কিনে আনিনি,' নীলা বলেছিল, 'সেদিন আপনি ওষুধটার নাম বললেন, তাতেই মনে পড়ে গেল ওটা আমাদের ঘরে ছিল। মার জন্যে কেনা হয়েছিল, কিন্তু মা মোটে চামচ দুই খেয়েছিলেন।'

মিথ্যা কথা। কিন্তু মিথ্যাও সময়ে সময়ে মহৎ হয়ে উঠে। গ্লাসে ওষুধ নিজে হাতে ঢেলে দিয়েছিল নীলা, জল মিশিয়েছিল। ওষুধ খেয়ে ইন্দ্রজিৎ এদিক ওদিক তাকিয়ে তোয়ালেটা খুঁজল বোধ হয়।

'নেই।' নীলা বললে, 'আমি কেচে দিয়েছি।'

বিছানার চাদরটারই একটা কোণা তুলে ইন্দ্রজিৎ ঠোঁট মুছতে যাবে, নীলা ধমক দিলে, 'এখনো আপনার নোংরা স্বভাব গেল না। ওই জন্যেই তো বার বার অসুখে পড়েন। কোঁচার খুট দিয়ে বরং মুছুন।'

বোকার মত একটুখানি অপ্রতিভ হেসেছিল ইন্দ্রজিৎ। কোঁচার খুট ছাড়া ঘরে আরো একটা জিনিস ছিল, শাড়ির আঁচল। কিন্তু মানুষের কিংবা মেয়ে মানুষের মনের ইচ্ছের না হয় লাগাম নেই, প্রকাশের তো আছে।

'আপনি আমার জন্যে অনেক করলেন।'

সহজ, শিশুসুলভ কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি, তবু সমস্ত চিত্ত নীলার বিমুখ হয়ে উঠেছে। ইন্দ্রজিতের গাঢ়কণ্ঠ কথাগুলোও যেন কৃতজ্ঞতার শব্দচ্ছদ পরানো। যার জন্যে মনে কামনার অন্ত নেই, সেই জিনিষটিই যখন প্রত্যুপকারের পণ্য হিসাবে আসে তখন মন থেকে তৃষ্ণার উৎস যেন শুকিয়ে যায়?

একথা কি নীলা কখনো জানত প্রমথ পোদ্দার শুধু দাবা খেলতেই আসে না, কিংবা খেলতে এসে ফিরে যায় না শুধু হাতে। আস্তে আস্তে ওর ক্যাশ বাক্স ভরে উঠেছে মার শেষ রুলি দু'গাছিতে, রুপোর পানের বাটায়, বাবার ঘড়ির ব্যাণ্ডটায়, সেকেলে, হয়ত নীলার অন্নপ্রাশনের সময়কার, একজোড়া নূপুরে। এক হাতে সব পকেটে পুরেছে প্রমথ, আরেক হাতে দান দিয়েছে; আর কত বাকি। আরো ক'টা চালে মাৎ হবেন শিবব্রতবাবু।

শেষ পর্যন্ত যদি বাবার বোতামের সেট্‌টাও প্রমথর হাতে তুলে দিতে না হত, তা হলে মা কথাটা পাড়তেন কিনা সন্দেহ।

রাঁধতে রাঁধতে মা উঠে এসেছিলেন। কিছুক্ষণ ইতস্তত করেছিলেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

'কিছু বলবে মা?' নীলাই জিজ্ঞাসা করলে।

'আমার একটা কথা রাখবি নীলি?'

নীলা জিজ্ঞাসু চোখে চেয়ে রইল। মা এক মুহূর্ত ইতস্তত করে বললেন, 'তুই একবার দেবুর ওখানে যাবি?'

বিস্মিত, বুঝি বা ঈষৎ স্তম্ভিত হয়ে নীলা বললে, 'দাদার কাছে আমি? কেন, মা?'

'কেন? বুঝিসনে কেন? ওঁর অসুখ চলেছে…হাতে কিছু নেই…তুই সব কথা দেবুকে বলে আমার কাছে একবার আসতে বলবি। আর', মা একটু থেমে আবার বললেন, 'বৌয়ের কাছে দোষ তো করেছিলি তুই, না হয় আরেকবার মাপ চাইবি। সম্পর্কে বড়ো, এতে কোনো লজ্জা নেই। হাজার হলেও বড়ো ঘরের মেয়ে তো, ও নিশ্চয় ক্ষমা করবে।'

'মাপ করো, মা। আমি পারব না।'

'পারবি না?' তীক্ষ্ম চোখে মা খানিকক্ষণ চেয়ে রইলেন। 'বেশ। তুই না যাস, আমাকেই যেতে হবে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, 'তোদের সকলের প্রাণের চেয়ে আমার নিজের মান তো বড়ো নয়।'

মা যাবেন? ছেলের বড়োলোক খুড়শ্বশুরের বাড়িতে বৌয়ের মান ভাঙাতে? এক মুহূর্ত কী ভাবলে নীলা, চট করে উঠে দাঁড়াল। —'তোমাকে যেতে হবে না মা, আমিই যাচ্ছি।'

ফিরে এল ঘণ্টা দুই পরে। মা উৎসুক চোখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী হল রে?'

হাতের ব্যাগটা বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলে নীলা বললে, 'কী আবার হবে। গিয়েছিলাম।'

'দেখা হল দেবুর সঙ্গে ?'

'না। দাদা টুরে গেছেন।'

'বৌমার সঙ্গে ?'

'হয়েছে।'

মা তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে মেয়েকে যাচাই করলেন কিছুক্ষণ। 'ওরা তোকে বুঝি অপমান করেছে রে ? বৌমা বুঝি চিনতে না-পারার ভাণ করেছে ?'

'আঃ মা,' নির্জীব গলায় নীলা বললে, 'দয়া করে চুপ করো। একটু নিরালা থাকতে দাও। অপমান ? অপমান করেছে বৈকি। তবে অসাধারণ ঘরের মেয়ে কিনা, একটু অসাধারণভাবেই করেছে। আমি যেতেই সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠল, খাতির করে বসাল। জলখাবার এনে দিল, বৌদি এমনভাবে হেসে কথা কইতে শুরু করে দিল, যেন কিছুই হয়নি।'

'এখানকার অবস্থা কিছু বলিসনি ?'

'বলতে আর ফুরসৎ পেলাম কই। অত আদর আর অত খাতিরের মাঝখানে কি নিজের অভাবের কথা মুখ ফুটে বলা যায় ?'

'তুই যখন গেলি, তখন বৌমা কী করছিল রে ?'

'পাখা খুলে দিলে, পোষা কুকুরটাকে কপট ধমক দিলে একবার। একগাদা শাড়ি এনে বললে, "ফ্যাসান ফেয়ার থেকে এগুলো কিনেছি এবার। দাম দু'শো—কাকা দিয়েছেন জন্মদিনে। এটা দেড়শো—আমার দিল্লীর পিসতুতো বোন টাকা পাঠিয়েছিলেন, সেই টাকায় কেনা। আর এটা তোমার দাদার দেওয়া। তুমি ফ্যাসান ফেয়ারে কখনো গিয়েছ ঠাকুরঝি ? ওখানে সস্তায় এমন মনের মতো জিনিস পাবে—চলো না একদিন"।'

'তুই কী বললি ?'

'আমি আর কী বলব। পরনের এই শাড়িটাই কাঁধের কাছে খোঁচা লেগে ছিঁড়েছে সেটাকে ঢেকে জড়োসড়ো হয়ে বসলাম।'

'তারপর ?'

'তারপর দু'জন ভদ্রলোক এলেন। আলাপে বুঝলাম মোটরের ক্যানভাসার। ক্যাটালগ খুলে নানা রকম দরদস্তুর হল। দাদা তো নেই, বৌদিই আলাপ জমালেন। শেষে আমার সঙ্গে ওঁদের পরিচয়ও করিয়ে দিলেন, "আমার ঠাকুরঝি মিস্ নীলা রায়। ইনিও কিছুদিন থেকেই একটা 'কার' কিনতে চাইছেন। এঁর সঙ্গে আলাপ করুন না।" বলো মা, এর চেয়ে অপমান মানুষ মানুষকে করতে পারে ?'

'তুই কী বললি ?'

'দালাল দু'টো তিন চারটে ক্যাটালগ নিয়ে আমাকে ছেঁকে ধরেছিল। কোন্ মডেলের দাম কত, কোন্টার পিক্-আপ ভালো, কোন্টার সুইপ গড়ানো টাকার মতো, সব বোঝাতে শুরু করেছিল। আমার কান দু'টো তখন লাল হয়ে উঠেছে। আমার মোটরের প্রয়োজন নেই বলে ওদের নমস্কার করে কোন গতিকে ছুটে পালিয়ে এসেছি।'

১৬

একে একে যারা জমেছিল কিনু গোয়ালার গলিতে, তাদেরই মধ্যে একে একে দু'চারজন খসে পড়তে শুরু করেছে। পালা গানের শেষটুকু না দেখেই দু'চারজন দর্শক যেমন সরে পড়তে থাকে, এ তেমনি।

স্টেলা গেল ভিভিয়ানের সঙ্গে। কী রকম কাজিন কে জানে, ছেলেবেলায় দু'জন নাকি একই মিশনে ছিল। দু'টি নিরাশ্রিতের মধ্যে সুখ দুঃখ ভাগা-ভাগির বন্দোবস্ত তখন থেকেই হয়েছিল কিনা এখন বলা শক্ত। তারপর দু'জন দু'দিকে ছিটকে পড়েছিল, স্টেলা মিশন থেকে নার্সিং স্কুল, সেখান থেকে হাসপাতাল ফেরতা হয়ে সেবাসত্রে। আর ভিভিয়ান কতো ঘাটের জল খেয়েছে হিসেব নেই, এখন আছে একটা ওয়ার্কশপে। ছেলেবেলাকার অনেক দৌরাত্ম্যের চিহ্ন আছে কনুইয়ে, পিঠে, হাঁটুতে। পরিণত বয়সে আরো একটা যোগ হয়েছে, গালে। গভীর একটা ক্ষত, এটাও আছাড় খাবার চিহ্ন, তবে গ্লাস হাতে নিয়ে। দু'একটা টুকরো হয়তো বিঁধে গিয়ে থাকবে।

যাবার দিন স্টেলা একটা ছোট্ট চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল। শকুন্তলাকে মুখোমুখি জানাতে সাহস হয়নি। শরীরের ওপর অমিত অত্যাচার করে নিজেও ডুবতে বসেছে ভিভিয়ান, রুগ্ন স্ত্রীর প্রতিও দুর্ব্যবহার করতে শুরু করেছে। কারুর কথা শোনেনা, একমাত্র স্টেলা ছাড়া। অনেক ঘুরে স্টেলার কাছেই ফিরে এসেছে যখন, স্টেলা ওকে এলকোহলের প্রলয়পয়োধি থেকে বাঁচাবে।

'মহৎ ব্রত', চিঠিটা মুড়ে রেখে শকুন্তলা বললে, 'কিন্তু বোকা মেয়েটার মাথায় এটা কেন ঢুকল না যে, লোকটা যে আজ ওর কাছে এসেছে সে ওই মদের নেশাতেই এসেছে। ওকে স্টেলা মদ ছাড়াবে যেদিন চোখের ঘোর ছুটবে, সেদিন ও আবার নিজের স্ত্রীর কাছেই ফিরে যেতে চাইবে।'

এতদিন বনমালী সরকার শুধু দূর থেকেই শরসন্ধান করেছে; তার যে কখনো আবার সামনা-সামনি এসে দাঁড়াবার সাহস হবে, শকুন্তলা কল্পনা করেনি।

কালোকে যদি কবিত্ব করে নীল বলা যায়, তবে এ বনমালী নীলকলেবর; বসন পীত নয়; শুভ্র খদ্দরের। দরজা খুলে দিয়ে শকুন্তলা অবাক হল। মুখের ওপর কবাট বন্ধ করে দেবে কিনা স্থির করতে যতটুকু সময় লাগল, বন-মালী তারই মধ্যে ঢুকে পড়েছে। এসেছে যখন ভালোই হয়েছে, ওর সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়োজন শকুন্তলারও ছিল।

'এখনো বাসায় আছো?'

'আপনি তো জানেন আজকাল আমার বাইরে বেশি ডাক পড়ে না।'

'পড়ে না নাকি। ওপরে চলো। বসতেও বলবে না?'

'চলুন। কিন্তু আপনি আর কী চান বনমালীবাবু। আর কী কী অস্ত্র আছে আপনার—'

বনমালী বোকার মতো তাকাল। 'অস্ত্র ? আমি কিছুই বুঝতে পারছি না শকুন্তলা।'

'পারছেন না ? দূর থেকে ক্রমাগত বাণ ছুঁড়েছেন, শিকার ছটফট করছে কিনা দেখতে ছুটেও এসেছেন, তবু পারছেন না ? আর ভালোমানুষ সাজবেন না বনমালীবাবু। আপনি সাপ্তাহিকে সেবাসত্রের নামে কলঙ্ক রটনা করেন নি ? আপনি প্রচার করেন নি যে বিবাহেতর সুখের লোভ কারুর যদি থাকে, সে আসুক এই সেবাসত্রে ? আমরা টাকার বিনিময়ে অবাঞ্ছিত মাতৃত্বের সম্ভাবনাকে রোধ করি, এ রটনাও আপনার কিনা বলুন ?'

প্রথমটা বনমালী ভালোমানুষের মতো মুখ করে বসেছিল, আস্তে আস্তে মুখের পেশিগুলো ওর কঠিন হয়ে উঠল ; যেন নিজেকে গুছিয়ে নিলে। বললে, 'আমিই। আমিই রটিয়েছি। সবই তোমার ভালোর জন্যে শকুন্তলা। যদি তোমার মত বদলায়, যদি—'

'মত বদলেছে কিনা দেখতেই আজ এসেছেন বুঝি। আপনি বাড়ি যান বনমালীবাবু! মত আমার বদলায় না। বাড়ি ফিরে গিয়ে কলমে যত বিষ জোগায় ঢালুন গিয়ে। আপনার বিষকে আমার আর ভয় নেই।'

আধবোজা চোখে বনমালী মোহিত ভঙ্গিতে হাসল। 'জানি। জানি বলেই তো বার বার আসি।'

কিন্তু বনমালীর সব অস্ত্রের খবর রাখেনি শকুন্তলা। শুধু শব্দভেদ নয়, ঘরভেদের মন্ত্রও তার জানা।

বেলা গেছে, অণিমা শুয়ে, গীতার মনও উড়ু উড়ু। বাইরে বাইরে ঘোরে গীতা, বাসায় ফিরে ক্লান্ত হাত পা ছড়িয়ে দেয়। 'বড্ডো মাথা ঘুরছে শকুন্তলাদি।'

'ঘুরবে না ? দিনরাত ঘুরিস কেন।'

'ঘুরি কি সাধে ; কপালে ঘোরায়। আর, ঘোরাঘুরির জন্যে কি আর মাথা ঘোরে। পেটে খেলে মাথাতেও সয়। রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে পা দুটো অবশ হয়ে আসে ; পুরুষমানুষ হলে একটা গাছতলা দেখে দু' দণ্ড জিড়িয়ে নেওয়া যেত। মেয়েমানুষ, রাস্তার মোড়ে দু'মিনিট দাঁড়ালেই লোকজন তাকাতে শুরু করে। বিপদ কি কম। আবার খিদে পেলে দু'-পয়সার চীনেবাদাম কিনে চিবোতে চিবোতে যাব, কিম্বা রাস্তার কল থেকে হাত পেতে জল খেয়ে নেব, সেও ভারি বিশ্রী দেখাবে।'

গলির মুখটা যেখানে পার্কের পাশে বড়ো রাস্তায় মিশেছে, ঠিক সেখানে একদিন সন্ধ্যাবেলা শকুন্তলা দেখতে পেল, গীতা কার সঙ্গে যেন কথা বলছে। লোকটার মুখ অন্যদিকে ঘোরানো ছিল, অল্প আলোয় চেনা গেল না। তবু ভঙ্গিটা পরিচিত মনে হল।

গীতা বাসায় ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করবে ভেবেছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত শকুন্তলার খেয়াল ছিল না।

আবার দিন তিনেক পরে গীতাকে একটা রিক্সা থেকে নামতে দেখল শকুন্তলা। সেও পেছনে পেছনে আসছিল, গীতা দেখতে পায়নি। বাসার চৌকাঠ পেরিয়ে তবে শকুন্তলা গীতার পিঠে হাত রাখল। 'কোথায় গিয়েছিলি ?'

এক মুহূর্ত চমকে গীতা, পর মুহূর্তে কান পর্যন্ত হাসি ছড়িয়ে দিতে চেষ্টা করল। 'উঃ, শকুন্তলাদি, কতো ঘোরা যে ঘুরেছি আজ, পা দুটো আর নেই মনে হচ্ছে।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে শকুন্তলা আস্তে আস্তে বলল, 'তুই কিন্তু অবাক করলি গীতা। রিক্সার ঝাঁকুনিতে কোমর পিঠ কখনো কখনো ব্যথা হয় শুনেছি, কিন্তু পা ধরে গেল বোধ করি তোর প্রথম।'

গীতা অপ্রতিভ মুখে আবার কী একটা কৈফিয়ৎ হয়ত দিতে গিয়েছিল, কিন্তু শকুন্তলার চোখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

নিজের জন্যে আলাদা এক পো করে দুধ নিচ্ছে গীতা, আবার সেদিন বেড়িয়ে ফেরবার সময় খান দুই সাবান নিয়ে এল। সুগন্ধ তেল, স্নো। লুকিয়ে রাখে সব, বিছানার নিচে, আনাচে, কানাচে।

সেদিন দরজা ভেজিয়ে গীতা আয়নার সমুখে দাঁড়িয়ে মুখে ক্রীম ঘষছিল, সেটা শুতে যাবার প্রাকমুহূর্ত। ভেবেছিল শকুন্তলা ঘুমিয়ে পড়েছে বুঝি। গলা অবধি চাদরটা নামিয়ে দিয়ে শকুন্তলা যে ওর দিকেই চেয়ে আছে টের পায়নি প্রথমে। ক্রীমটা লুকিয়ে রাখতে এসে মুখোমুখি পড়ে গেল।

'গাল দুটো ভারি চড় চড় করছে শকুন্তলাদি। তাই একটু—'

শকুন্তলা আবার চাদরটা মুখের ওপর টেনে দিয়ে মুড়ি দিল। শীতকালে মুখ চড় চড় করা কিছু বিস্ময়ের নয়, কিন্তু এত স্নো-ক্রীম কোথা থেকে আসছে, বিস্ময় সেইটেই।

ইচ্ছে হলে গীতাকে জিজ্ঞাসা করা যায়; ওর অনুপস্থিতিতে বিছানা ঘাঁটাঘাঁটি করেও রহস্যোদ্ধার করার চেষ্টা চলতে পারে। কিন্তু নিজেকে অত নামাতে শকুন্তলা পারবে না। হোঁচট খেয়ে পিছে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু নিচে নামবে না।

ফাল্গুনের শুরুতেই একদিন সেবাসত্রের ঠিকানায় গোলাপী খামে অনেকগুলো চিঠি এল। ললিতার বিয়ের নেমন্তন্ন। সবার নামে নামে চিঠি দিয়েছে। অরবিন্দর বাবার নাম স্বাক্ষরিত চিঠি, ব্যাপারটা তা হলে রীতিমত সামাজিক মতেই হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত অরবিন্দর বাবা সম্মতি দেবেন কিনা, ললিতার সন্দেহ ছিল। সব গোলমাল চুকে গেছে, নিমন্ত্রণ পত্রের স্বাক্ষর তার সাক্ষী। শকুন্তলা মনে মনে ললিতার উদ্ভাসিত মুখখানা যেন দেখতে পেল।

প্রত্যেক চিঠিরই উল্টো দিকে যদিও ললিতা নিজের হাতে সবাইকে যেতে সবিনয় মিনতি জানিয়েছে, শকুন্তলার মনে হল নিজে এসে কি ললিতা একবার সবাইকে বলে যেতে পারত না। হয়ত বিয়ের টুকিটাকি কিনতেই ব্যস্ত। কিন্তু পাঁচ সাত মিনিটে কীই বা এসে যেত।

কিন্তু এতকালের বন্ধুত্ব, পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটিও মার্জনা করতেই হবে, সবার কাছে যা আছে কুড়িয়ে বাড়িয়ে একটা পছন্দসই প্রেজেণ্ট কেনার কথাও ভাবতে হবে।

গোটা কুড়ি টাকা সংগ্রহ হল। এতে মনোমতো জিনিস পাওয়া মুশকিল ; কিন্তু রুচিসই হলেই হল। ললিতা তো জানে তার সেবাসত্রের বন্ধুদের হাঁড়ির হাল কী।

তিনজনই যাবে বলে ঠিক ছিল, কিন্তু রওনা হবার ঠিক আগের মুহূর্তটিতে গীতা বেঁকে দাঁড়াল।

'কী হয়েছে বল।' শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করল।

অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল গীতা ; তারপর বলল, 'আমার শরীর ভালো নেই। তোমরা যাচ্ছ, তাতেই আমার যাওয়া হয়ে যাবে শকুন্তলাদি।'

'শরীর ভালো নেই ?' তীক্ষ্ন কণ্ঠে বলে উঠল শকুন্তলা, তীক্ষ্নতর চোখে তাকাল। অল্প একটু হেসে বলল, 'শরীর তোর ঠিকই আছে গীতা, নেই মন। ললিতার বিয়ে হল, ললিতা সুখী হতে চলেছে, তুই হিংসেই জ্বলে পুড়ে মরছিস, না ? মেডিকেল স্টুডেণ্টটির ওপর মনে মনে তোরও লোভ ছিল বুঝি ? বল না ?'

গীতা কোন জবাব দিল না। যদি দিত, তবে হয়ত শকুন্তলা আজ আরো অনেক কথা বলত, যত জ্বালা ছিল উজাড় করে দিত সব। কিন্তু একটা কথাও বলল না গীতা, দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে রইল তো রইলই। রাস্তায় এসে শকুন্তলার মন খারাপ হয়ে গেল। ঝোঁকের মুখে এতগুলো শক্ত কথা বলা ঠিক হয়নি। হাজার হলেও এরা ছেলেমানুষ, শকুন্তলা ছাড়া অবলম্বন নেই ওদের। এত যে ঝঞ্ঝাট গেছে, শকুন্তলা কাউকে সামান্য আঘাতও দেয়নি ; আজ কী হ'ল, অকারণে কতগুলো রূঢ় কথা বেরিয়ে গেল।

যে বোর্ডিংয়ে থাকত ললিতা, তার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাসাতেই বিয়ের আয়োজন। এত যে ঘটা হবে, শকুন্তলা আগে থেকে ভাবতেও পারেনি। শালু দিয়ে সাজানো গেট, মঙ্গলঘট, বিজলীর দ্যুতি। অল্পচেনা কেউ বাদ পড়েনি, মোটর গাড়িই দাঁড়িয়ে আছে তিন চার খানা। ডাঃ উপাধ্যায়ও এসেছেন। তিনি বড় ব্যস্ত। তিনি কিছু খাবেন না। কোথাও খান না, তবু এসেছেন। অরবিন্দ আর ললিতা দুজনেই তাঁর স্নেহের পাত্রপাত্রী, শুধু আশীর্বাদ করে যাবেন।

আশীর্বাদ করতে এসে ললিতার পাশে শকুন্তলা আর অণিমাকে দেখে একটু থমাক দাঁড়ালেন। ভ্রু আপনা থেকেই কুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল, সেটুকু

ঢাকতেই রুমাল বার করে মুখ মুছলেন। চশমা ঠিক করে নিলেন একবার। শকুন্তলা শঙ্কিত হয়ে উঠল। সে জানে এটা উপদেশের ভূমিকা। এখানেই উপদেশ দিতে শুরু করবেন নাকি ডাঃ উপাধ্যায়, এই একঘর লোকের সামনে,—নম্রনত বধূবেশিনী একটি সার্থক মেয়ের পাশে আটপৌরে কাপড় পরা ম্লানমুখী দুটি মেয়েকে বোঝাতে শুরু করবেন কেন তারা ব্যর্থ হল।

কিন্তু বড়ো ব্যস্ত ডাঃ উপাধ্যায়; আজ হয়ত উপদেশটুকু দেবারও ফুরসুৎ নেই। ললিতাকে সামান্য দু'একটা সময়োচিত মিষ্টি কথা বলেই বিদায় নিলেন।

ঘরের ভেতর হাঁপিয়ে উঠছিল ললিতা। বললে, একটু ছাতে যাবে শকুন্তলাদি। চলো না ফাঁকায় দাঁড়াই একটু।'

চিলেকুঠির সামনে দাঁড়িয়ে ললিতা বলল, 'তোমরা এসেছ আমি ভারি খুশি হয়েছি, শকুন্তলাদি। নিজে যেতে পারিনি বলে গীতা বুঝি রাগ করে এল না?'

শকুন্তলা কী একটা কৈফিয়ৎ দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু সে-কথার ললিতার কান নেই।

'জানো শকুন্তলাদি, এ বিয়ের সব খরচ ও দিচ্ছে। সব! ওর বাবা আমাকে এসে দেখে গেছেন, কী ভালো মানুষ যে, কী বলব। ওর তো মা নেই, আমাকেই নাকি গিয়ে সংসারের সব ভার নিতে হবে। বলো তো শকুন্তলাদি, আমি কি অতসত পারব। সংসারের আমি কী জানি।'

মুখ টিপে টিপে হাসছিল শকুন্তলা। বলল, 'জানবি ক্রমে ক্রমে; সবাই যেমন করে জানে। তোর ছেলে হতে আমাদের কিন্তু খবর দিস ললিতা; কেসটা অগ্রিম বুক্‌ করে গেলাম।'

মাথাটা নুইয়ে দিল ললিতা, লাজুক চোখ দুটি তুলে বলল, 'ছেলে তো হবে না শকুন্তলাদি।'

শকুন্তলা হেসে ফেলল। 'ছেলে হবে না কিরে?'

'ছেলে না, মেয়ে। ও বলেছে প্রথম নাকি মেয়ে হওয়াই ভালো—'

স্মিত মুখে শকুন্তলা খুঁটিয়ে দেখছিল ললিতাকে। কী বোকা-বোকা, অথচ সুখী দেখাচ্ছে ললিতাকে; অস্বীকার করে লাভ নেই, সুন্দরও দেখাচ্ছে। কত অল্প পেলেই মেয়েরা সুখী হয়ে ওঠে শকুন্তলার চোখে যেন প্রথম ধরা পড়ল। কে জানে, মেয়েদের বোকামিই সুখ কিনা, সুখই সৌন্দর্য কিনা।

ফিরতে যত দেরি হবে ভেবেছিল, তার চেয়েও কিছু কমই হল। আজ বোধ হয় একসঙ্গে অনেকগুলো বিয়ের তারিখ, বাড়ি বাড়ি এখনও কয়েকটা অবসন্ন বিজলী আলো জ্বলছে। গলিতে তো ঢোকা গেল, কিন্তু বাসায় দরজা খোলে না।

'গীতাটা ঘুমিয়ে পড়েছে।' বলল অণিমা।

আরো বারকতক কড়া ধরে নাড়তেই হঠাৎ এক সময়ে সশব্দে দরজা খুলে

গেল। ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে শকুন্তলা বিরক্ত গলায় বললে, 'এতক্ষণ করছিলি কী ?'

'ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।'

শকুন্তলা তাকাল গীতার দিকে। শিথিল আঁচলে, ভাঙা খোঁপায়, আলস্যের একটা হাই-তোলা ভঙ্গি আছে, কিন্তু চোখ দুটোতে এমন কিছুই নেই যাতে মনে হতে পারে সে এইমাত্র ঘুমিয়ে উঠেছে অকারণে গীতাকে একটা মিছে কথা বলতে শুনে অবাক হল।

অবাক হতে আরো একটু বাকি ছিল। বসবার ঘরের দরজা ভেজানো, ভেতরে আলো জ্বলছে দেখে শকুন্তলা আস্তে আস্তে একটা কবাট খুলল। চেয়ারে বসে আছে বনমালী সরকার, কী একটা বই পড়ছে।

'আপনি এ-সময়ে ?'

চোখ থেকে চশমাটা খুলে পরিষ্কার করে পকেটে রাখল বনমালী। হাই তুলে বলল, 'তুমি এতক্ষণে এলে ? আমি সেই থেকে বসে বসে—'

'আপনি এ-সময়ে কেন, সেই কথাই জিজ্ঞাসা করেছিলাম।'

'আমি তো আসি।' বনমালী হাসল, 'আর তুমি তো জানো, সন্ধ্যার পরে ছাড়া আমার সময় হয় না। দেখতেই পাচ্ছ, আমি এখনো হাল ছাড়িনি শকুন্তলা।'

তারপর বনমালী পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করল। 'এইটে পড়ো।' ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে নিতেই শকুন্তলা অবাক হয়ে গেল। তাকাল বনমালীর দিকে, সে অল্প মিটমিটে চোখ হাসছে। আজ একেবারে নতুন ধরনের অস্ত্র নিয়ে এসেছে বনমালী। কাগজটাতে সেবাসত্রেব স্তুতিপূর্ণ একটা লেখা। কাগজের কর্তৃপক্ষ অনুসন্ধান করে জানতে পেরেছেন কলকাতার একটি সেবিকা প্রতিষ্ঠানের নামে সম্প্রতি যে সব গুরুতর অভিযোগ শোনা গেছে, তা সর্বৈব মিথ্যা, ইত্যাদি।

'আপনি লিখেছেন ?'

বনমালী ঘাড় নেড়ে স্বীকার করল। 'আমিই। এখন বোধহয় বুঝতে পেরেছ আমি নেহাৎ খারাপ লোক নই। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো, শকুন্তলা—'

বাধা দিয়ে শকুন্তলা বললে, 'এত চট করে আমার মত বদলায় না। আপনি আজ বরং আসুন বনমালীবাবু। আমাকে ভাবতে সময় দিন একটু।'

'বেশ।' বনমালী বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'আমি শুধু অনিষ্টই করতে জানি না শকুন্তলা।'

বনমালী চলে যেতে শকুন্তলা ওদের শোবার ঘরে এল ? গীতা ততক্ষণে আবার শুয়ে পড়েছে। শকুন্তলা জিজ্ঞাসা করল, 'ঘুমিয়েছিস ?'

গীতা জড়িত স্বরে কী জবাব দিল বোঝা গেল না।

শকুন্তলা বললে, 'লোকটা কখন এসেছিল রে ?'

'অনেকক্ষণ, তোমরা যাবার একটু পরেই।'

'এতক্ষণ, এই তিন চার ঘণ্টা ধরে ও-ঘরে বসেছিল, আর তুই এ-ঘরে শুয়ে ছিলি ?'

'হ্যাঁ, শকুন্তলাদি।'

আবার অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে শকুন্তলা তাকাল গীতার দিকে। মানুষের জিভ যা বলে চোখ সব সময় তা বলে না, মিছে কথার মুশকিলই এই।

শকুন্তলা করল কি, কঠিন মুঠিতে গীতার মণিবন্ধ চেপে ধরল। তুই লুকোচ্ছিস গীতা। এই লোকটা সারাক্ষণ এ-ঘরেই ছিল, আমরা এত শিগ্‌গির এসে পড়ব, তোরা ভাবতে পারিসনি ; ঠিক কিনা বল।'

গীতার হাতখানা অবশ হয়ে গিয়েছিল ; অস্ফুট একটা কাতরোক্তি করে আস্তে আস্তে বললে, 'হাত ছাড় শকুন্তলাদি।'

ভ্রূক্ষেপ না করে শকুন্তলা বলে গেল, 'তা হলে ওর সঙ্গেই তুই রিক্‌সা করে বেড়াতে যেতিস, ও-ই তোকে সাবান স্নো উপহার দিত, কেমন ? আমার কিছুদিন থেকেই সন্দেহ হচ্ছিল, আগে থেকেই বোঝা উচিত ছিল। শোন, গীতা তোকে স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি, এখানে ওসব চলবে না। ওকে তুই স্পষ্ট করে জানিয়ে দিবি, ও যেন আর এখানে না আসে।'

গীতা কী বলতে যাচ্ছিল, শকুন্তলা বলে গেল, 'আমি ওর নাড়ী-নক্ষত্র জানি আমাকে কী চেনাবি তুই। তোকেও বলি গীতা, এখানে থাকতে হলে ওসব চলবে না।'

সেদিন অনেক রাত্রি অবধি শকুন্তলার উত্তেজনা গেল না। বনমালীর বিজয়ী রূপটা যেন চোখের ওপর ভাসছে। এবার আবার বাইরে থেকে ঢিল ছোঁড়া নয়, ভেতরে ঢুকে ছোবল মেরেছে। শকুন্তলা রাজী না হলে কী হবে, বাঙলা দেশে মেয়ের অভাব নেই। শকুন্তলার ঘরেই এমন মেয়ে আছে, যে বনমালীর ইঙ্গিতমাত্রেই তার পেছনে ছুটতে প্রস্তুত।

রাগ হতে লাগল শকুন্তলার, কপালের রগ দুটি টন টন করছে ; রাগ হল ললিতার ওপর,—কেমন স্বচ্ছন্দে সংসার গুছিয়ে নিয়েছে ; অণিমার ওপর,—রুগ্ন মেয়েটা, বোঝার মতো ঘাড়ে চেপে আছে ; রাগ হল বনমালীর ওপর, গীতার ওপর ;—এমন কী দুরবস্থায় পড়েছিল গীতা—এখনো তো আধপেটা খেতে হয়নি—যে শেষ পর্যন্ত একটা দুশ্চরিত্র লোকের কথায় ভুলে—। ছি ছি। শকুন্তলার নিজের ঘরের মেয়েকে দিয়ে বনমালী শকুন্তলাকে জব্দ করল ; এ আপশোষটাই যেন সবচেয়ে বেশি।

ঠিক দু'দিন পরে সকালে উঠে গীতাকে দেখা গেল না। একখানা চিঠি পাওয়া গেল বিছানায়। সংক্ষিপ্ত কয়েকটা মাত্র কথা। 'চললুম'। আর কখনো দেখা হবে কিনা জানিনা। তবে নিশ্চিন্ত হতে পারো, বিপথে যাইনি। বনমালীবাবুর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা তুমি যা ভেবেছ তা নয়। উনি আমাকে বিয়ে করবেন। আগামী সপ্তাহেই তারিখ ঠিক হয়েছে। আশীর্বাদ করতে না পারো ক্ষমা কোরো।'

চমৎকার, চিঠিটা টুকরো করে ছিঁড়তে ছিঁড়তে শকুন্তলা ভাবলে।

গীতাকে বিয়ে করবে বনমালী। চমৎকার।

গীতার ফেলে যাওয়া তেলের শিশিটা পায়ে লেগে ঠুন করে গড়িয়ে পড়ল, খালি স্নোয়ের কৌটাগুলোও ছড়ানো এখানে ওখানে। ছেঁড়া একটা শাড়ি দরজার কোণে জড়ো করা। এগুলো গীতা নিয়ে যায়নি।

অণিমা তখনো বিছানায় শুয়ে ছিল। সেদিন শকুন্তলার রাগ হয়েছিল, আজ কিন্তু অদ্ভুত অনির্ণেয় একটা করুণায় মনটা ভরে আছে। কিম্বা একেবারেই বুঝি খালি হয়ে গেছে। আস্তে আস্তে অণিমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে শকুন্তলা বললে, 'শেষ পর্যন্ত তুই আর আমিই রইলাম অণিমা। তুই আর আমি।'

১৭

টেবিলের ওপর ক্লান্ত কনুই রেখে মণীন্দ্র দু'হাতে মুখ ঢেকে চুপ করে বসে ছিল। এখনো প্রেক্ষাগৃহ থেকে সব লোক বেরোয় নি। অনেক গলার আলাপ, অনেক জুতো চলার খস খস এখনো। আর একটু পরেই চড়া আলোগুলো একে একে নিবে যাবে, ঝাড়ু পড়বে। ধুলোর মুখে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে একটা রজনীর অভিনয়স্মৃতি।

প্রথম নাটকখানার আজ শততম অভিনয় হয়ে গেল। একটু আগেও সমস্ত আবহাওয়া কী উত্তেজনা-জর্জর হয়ে ছিল। নটগুরু বক্তৃতা দিয়াছেন, জবাবে মণীন্দ্রকেও বিনীতভাবে কিছু বলতে হয়েছে। তারপর অভিনয়। প্রতি দৃশ্যের শেষে হাততালি, এমন কি কোন কোন অংশ পুনরাভিনয়ের ফরমাস।

যে বই লেখা হয়ে বাড়িতে তোরঙের নিচে ছ'মাস পড়ে ছিল অজ্ঞাতবাসে, ছাপা হবার পর বইয়ের দোকানে দোকানে ধূলিধূসর র‍্যাকে অবজ্ঞাতবাসে, তারই নাট্যরূপের শততম প্রদর্শনী হবে, একথা মণীন্দ্রের পক্ষে বিশ্বাস করা শক্ত হত।

কিন্তু এ ছ'মাসে বিশ্বাস করার শক্তি তো কিছু কম বাড়ল না। কিছুতে বিশ্বাস ছিল না মণীন্দ্রের, না ঈশ্বরে, না ধর্মে। পতিব্রতা, পত্নীপ্রেম, পুত্র-স্নেহ, মাতৃভক্তি ইত্যাদি উঁচুদরের মনোবৃত্তির নামে হাসাহাসি করত। সেই মনটা ধীরে ধীরে কেমন বদলে যাচ্ছে। বিশ্বাস করার শক্তি বাড়ছে তার। ধর্মে, ঈশ্বরে, দৈবে। শুধু সুবচনী আর ইতুপুজো ছাড়া সমস্ত আচার অনুষ্ঠানে। পাপীদের অনন্ত নরকবাসে পাঠাবে এমন ঐশ্বরিক শক্তি তার নেই, কিন্তু যতটুকু তার সামর্থ্য, ততটুকু সে করছে। মণীন্দ্রের নাটকের দুর্বৃত্তদের অনন্ত অনুতাপ ললাট-লিখন, তাদের কুকুরে কামড়াবেই, কুকুরের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া গেল তো রেল-দুর্ঘটনার হাত থেকে বাঁচায় কে।

অদৃষ্ট তার দিকে দক্ষিণমুখে চেয়ে স্মিত হেসেছে, অদৃষ্টকে মণীন্দ্র মানবে বৈকি।

দু'খানা নাটক চলছে, একখানার তো শততম অভিনয় হয়ে গেল, আর

একখানা মহড়ায় পড়েছে। এ বেশ ভালো, নাটক লেখা কিম্বা উপন্যাসকে নাট্যরূপ দেওয়া। জীবনের ভাষ্য রচনার গুরুতর দায়িত্ব নেই, কেবলমাত্র কয়েকটি চরিত্রকে মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দাও, কিছু জোরালো কথা জুগিয়ে যাও। কিছুটা অবাস্তব, কিছু অতিবাস্তব, কিছু আকস্মিকতা এর নামই তো নাটকীয়তা।

যতদিন গল্প-উপন্যাস লিখেছে, ততদিন কে চিনেছে মণীন্দ্রকে। সম্পাদকেরা পাতা ভরাতে ছেপেছেন, প্রকাশকেরা অনিচ্ছায় নিয়েছেন। বিজ্ঞম্মন্য সমালোচকেরা কখনো গালে চড় মেরেছেন, কখনো বা সেই হাতেই পিঠ চাপড়েছেন। দু'চার ছত্রে লিপিকুশলতার সেই স্বীকৃতি পড়ে নিজের শক্তির ওপর ধিক্কার এসেছে। কী হবে লিখে, সারা জীবনভোর এই মাঝামাঝিত্বের ফোঁটা-পরা কপাল নিয়ে ঘুরে। যা দিয়ে অমৃত পাওয়া যাবে না, তা নিয়ে কী করব।

তার চেয়ে এই ভালো। এখানে প্রবেশ দুরূহতর, কিন্তু একবার ছাড়পত্র পেলে আর কথাই নেই ; তারপর স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো অদৃষ্ট আপনার কাজ করে যাবে। এখানে প্রতিযোগিতা কম। হাততালির পরিমাণের ওপর সার্থকতার বিচার। বাংলা নাটককে এখানে সাহিত্যের অঙ্গ হিসাবে দেখা হয় না, সেটা এক হিসেবে বাঁচোয়াও।

গলায় গাঁদাফুলের মালা, পকেটে টাকার তোড়া, মণীন্দ্রের সব সমস্যা মিটেছে।

'বাড়ি যেতে হবে না ?'

মাথা তুলে মণীন্দ্র তাকিয়ে দেখল, চামেলি। এরই মধ্যে মুখের রঙ ধুয়ে পোষাক বদলে তৈরি হয়ে এসেছে। চোখের কাজল তবু সবটা মোছেনি, একেবারে মিলিয়ে যান নি ওষ্ঠ-কপোলের রঞ্জনী।

'আমার ভারি ঘুম পাচ্ছে।' চামেলি বলল হাই তুলে।

'চলো।'

গাড়িতে শরীর ঢেলে দিয়ে চামেলি বলল, 'আজ আমার পার্টটা কী রকম করলুম বলুন তো।'

'ভালোই তো, খুবই ভালো।'

খিল খিল করে হেসে উঠল চামেলি। 'উঁহু, ও রকম ভাসাভাসা ভালো বললে চলবে না। অন্য দিনের চেয়ে ভালো হয়েছে কিনা বলতে হবে মশাই। ভাবছেন যে যত ক্ল্যাপ পড়েছে সব বুঝি আপনার লেখার গুণে। আমরা যদি অমন প্রাণ ঢেলে পার্ট না করতুম, তাহলে লোক অত খুশি হত ভেবেছেন ?'

চামেলির হাতে আলগোছে একটু চাপ দিয়ে মণীন্দ্র বলল, 'আমি কি তাই বলেছি কখনো।

সামান্য একটু সরে গেল চামেলি, কিন্তু হাতখানা টেনে নিল না। 'তাহলে ক্রেডিটটা আমার পাওনা কিনা, বলুন।'

মণীন্দ্র করল কি, গলায় তখনো যে মালাটা ঝুলছিল, সেটা খুলে

চামেলিকে পরিয়ে দিল। 'সব তোমার। এবার হল তো।'

যতটা সরে গিয়েছিল চামেলি, ততটা সরে এল। নখ দিয়ে দু'একটা পাপড়ি ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলল, 'ছাই। গাঁদাফুলে গন্ধ নেই।'

'গন্ধও আছে।' কখন একখানা হাত পিঠের ওপর দিয়ে গিয়ে চামেলিকে বেষ্টন করেছিল খেয়াল নেই, মণীন্দ্র মুখের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল, 'গন্ধও আছে।...এবারে দেখলে?'

দু'হাতে নাক ঢেকে চামেলি জানালার দিকে মুখ ফেরাল। 'ছাই গন্ধ। আপনি আজ আবার ওসব খেয়েছেন?'

'একটুখানি।' মণীন্দ্র বলল, 'জিভের ওপর একটি মোটা ফোঁটা, পদ্মপত্রে টলোমলো শিশিরবিন্দু; বক্তৃতা দিতে হলে গালটা একটু না ভিজিয়ে নিলে কি জুৎসই হয়।'

গাড়ি এসে চামেলির দরজার সমুখে দাঁড়িয়েছিল।

'তোমার ড্রাইভারকে বলো না, আমাকে একটু পেঁছে দিয়ে আসবে।'

দরজা খুলে চামেলি নিচে দাঁড়িয়েছিল। বললে, 'আসবেই তো। কিন্তু তার আগে আপনি একটু ওপরে আসবেন না?'

'নাঃ, বিশ্রী মাথা ধরে আছে।'

হাতের ক্ষুদ্রাকৃতি ঘড়িতে সময় দেখে চামেলি বললে, 'আসুন না, কতো আর রাত হচ্ছে। এই তো সবে এগারোটা।'

ঠিক একটা গ্যাসের আলোর নিচে দাঁড়িয়েছে চামেলি, মুখের একাংশে শুধু আলো পড়েছে, আরেকটা দিক ঢাকা। ওপরে গিয়ে বিজলী আলোয় সেই অংশটুকু দেখার লোভ বুঝি দুর্জয় হল। মণীন্দ্র কিছু দেখতে পেলে না। 'চলো।'

বোতাম টিপতে ঘরে স্তিমিত নীল একটা আলো জ্বলে উঠল; ধবধবে বিছানায় গা ঢেলে দিলে চামেলি, পা তুলে দিল দেয়ালে। ইঙ্গিতে মণীন্দ্রকে বসতে বলল পালঙেকেই।

'কথা বলছেন না যে, কী হলো আপনার।'

'ভল তেষ্টা পেয়েছে', মণীন্দ্র বলল কোনক্রমে।

উঠে বসল চামেলি, এই শীতের রাতেও পাখাটা চালিয়ে দিল; বলল, 'সোডা খাবেন?'

'দাও', মণীন্দ্র বলল। তারপর ছিপি খুলতে খুলতে বলল, 'সোডা তো অনুপান মাত্র, ওষুধ কই?'

'ওষুধও আছে।' শিয়রের নিচে থেকে চাবি বার করল চামেলি, দুলতে দুলতে আলমারির দিকে এগিয়ে গেল। ফিরে এল হাসতে হাসতে। 'এই নিন। যা খেলে মাথা ধরে, তারই আবার দু'ফোঁটা খেলে মাথা ধরা সেরেও যায়, বুঝেছেন?'

মাথাটা নাড়ল মণীন্দ্র, কানের কাছে ঝিম ঝিম একটা শব্দ হল, কে জানে সেটা চামেলির চাবির কিনা। কলঘর থেকে ফিরে এসে চামেলি চড়াশক্তির

আলোটাকে জ্বালিয়ে দিলে। একেবারে পাশটিতে বসে বলল, 'মাথাধরা সেরেচে ?'

মণীন্দ্র ঘাড় নাড়ল।

'তেষ্টা ?'

'যায় নি।'

ঢং ঢং করে ঘড়িতে ক'টা বাজল শোনবার মতো মনের স্থৈর্য ছিল না। পর্দা-টানা জানালার ফাঁক দিয়ে অদ্ভুত ফুরফুরে হাওয়া আসছে, এই নরম সুখাস্তীর্ণ শয়নে গা ঢেলে দেবার সুখের তুলনা কই।

হঠাৎ এক সময় ধড়মড় করে উঠে বসল চামেলি। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলল, 'কী ব্যাপার মণীন্দ্রবাবু, আপনি এখনো এখানে ? বাড়ি যেতে হবে না বুঝি ?'

'হ্যাঁ, এই যে যাই।' উঠে দাঁড়াতে গিয়ে মণীন্দ্রের পা দু'টো অল্প একটু টলে গেল, খাটের পায়া ধরে সামলে নিল ঠিক। চামেলিও উঠে দাঁড়িয়েছে সঙ্গে সঙ্গে। 'আর একটু বসে যাবেন মণীন্দ্রবাবু। আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।'

বসতে পেয়ে মণীন্দ্র যেন বেঁচে গেল। একা একা সিঁড়ি বেয়ে নামতে হবে, আন্দাজে দরজার ছিটকিনি খুলে বেরুতে হবে বাইরে, ভাবতেই এতক্ষণ যেন মাথা কেমন ঝিম ঝিম করছিল। তবু ভাল একটুখানি আশ্রয় আবার পাওয়া গেল, একটুখানি বিশ্রাম।

কোথায় ছিল চেয়ার, সেটাকে টেনে এনে চামেলি একেবারে মণীন্দ্রর মুখোমুখি বসল। বলল, 'আপনার নাটকখানা তো সিনেমাও হচ্ছে, না ?'

'কই আমি কিছু জানিনে তো।'

'জানেন না ? আর ন্যাকামি করতে হবে না। জানেন সব, ভাঙচেন না। আমি জানি সব। দু'হাজার টাকা, কনট্রাক্ট তৈরি, শুধু সই করা বাকি।'

মণীন্দ্র করল কি, চামেলির একখানা হাত চেপে ধরল। 'তোমাকে ছুঁয়ে বলছি চামেলি, আমি কিছু জানিনে এ সব।'

হাতখানা ছাড়িয়ে নিল চামেলি। গম্ভীর গলায় বলল, 'শুনুন তবে। পপুলার আর্ট ফিল্মস কোম্পানীর মালিক আজ এসেছিলেন থিয়েটারে। এরও আগে দু-একবার বইখানা দেখে গেছেন। এ বইটার ওপর ভারি নজর। শিগগিরই হয়তো আপনার কাছে যাবেন। আপনি কিন্তু সস্তায় ছাড়বেন না। বুঝলেন ?'

'ছাড়ব না।'

অন্যমনস্কভাবেই একবার খোঁপাটা খুলে ফেলল চামেলি ; চুলের গোছা বুকের পাশে এনে অলস আঙুলে খেলা করতে লাগল। বলল, 'আপনাকে শুধু এই খবরটুকুই দিতে নিয়ে আসিনি মণীন্দ্রবাবু। আমার নিজেরও একটু ইনটারেস্ট আছে। থিয়েটারে যেমন, সিনেমাতেও তেমনি এই বইয়ের

হিরোয়িন হতে চাই। এই কাজটি আপনাকে করতে হবে।'

অনেকক্ষণ বসে থেকে মণীন্দ্রর আবার গলা শুকিয়ে এসেছিল, মাথাটা টিপ টিপ করতে শুরু করেছে। ইঙ্গিত বোঝামাত্র চামেলি ফের উঠে গিয়ে আলমারি খুলল, সোডার বোতল খুলে দিল। 'বলুন পারবেন কিনা।'

'আমি কী করে বলি। যাঁরা মালিক, পছন্দ-অপছন্দের এক্তিয়ার তো তাঁদেরই, চামেলি।'

হঠাৎ চোখ দুটো ছোট হয়ে এল চামেলির, দু'টো ভুরু নাকের ঠিক ওপরে এসে যেন মিশে গেল। 'বুঝেছি মণীন্দ্রবাবু, কাজ ফুরোলে লোক আর মনে রাখে না। এই সেদিনও আপনি বই বগলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন, আজ না হয় বড়ো নাট্যকার হয়েছেন। কিন্তু আপনার নাটকের প্রাণ দিলে কে? প্রতিটি কথাকে ঝক্‌ঝকে করে মেজে নিয়ে সুন্দর করে বললে কে? ভেবেছেন বুঝি লোকে শুধু আপনার বই শুনতেই আসে। তা হলে তো তারা কিনে পড়ত। তা নয় মণীন্দ্রবাবু, ওরা আমাদের দেখতে আসে।'

'জানি, চামেলি।'

অনাবৃত দু'টো হাত মাথার পিছনে নিয়ে গেল চামেলি, খুলে ফেলা খোঁপাটাকে আবার বাঁধল আলগোছা করে। 'স্বীকার করছেন তো, তবেই বুঝুন, এতটা খেটেখুটে জিনিসটা দাঁড় করালাম আমরা, আর আজ তার সবটুকু কৃতিত্ব চুরি করে নেবে আরেকজন এসে? তা হয় না মণীন্দ্রবাবু', চামেলি হঠাৎ জোর দিয়ে বলল, 'ফিল্মেও এই বইয়ের হিরোয়িনের পার্ট আমিই নেব; নইলে আপনি কি মনে করেন, আপনি নাম-না-জানা লেখক থেকে নাট্যকার, নাট্যকার থেকে সিনেমার মারফৎ ভারতবিখ্যাত হতে যাবেন, আর আমরা যেখানেই আছি, সেখানেই পড়ে থাকব। চিরকাল কাঠের স্টেজেই পা ঠুকে যাব, পর্দায় ছায়া ফেলব না? আমাদেরও আশা আকাঙ্ক্ষা বলে একটা পদার্থ আছে মণীন্দ্রবাবু।'

গ্লাসের তলানিটুকুও নিঃশেষ করে মণীন্দ্র বলল, 'আছেই তো।'

'মিছামিছি সায় দেবেন না। আছে সেটা আপনারা যেন বোঝেন কত। নইলে যে নন্দনবাবু আমার এখানে সপ্তাহে তিনদিন করে আসছেন, তিনি তাঁর ফিল্মের নায়িকার জন্যে সোসাইটি গার্ল খুঁজে বেড়াতেন না।'

'নন্দনবাবু কে?'

'ওই তো, পপুলার ফিল্মের প্রডিউসারের কথা বলছি। আমাকে এ-বইয়ের হিরোয়িনের পার্ট দেবেন কথা দিয়ে এখন তিনি ভদ্রঘরের মেয়ের জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন ছড়াচ্ছেন সে খবরও পেয়েছি। আচ্ছা মণীন্দ্রবাবু, এ আপনাদের এক কী বাতিক হয়েছে বলুন তো। থিয়েটার আমাদের নইলে চলে না, অথচ সিনেমার বেলাতে ভদ্রঘরের মেয়ে চাই।

'চালিয়াতি আর কী। মেকী একটা রেস্‌পেক্টবিলিটি—'মণীন্দ্র আবার সায় দিয়ে বলতে যাচ্ছিল, চামেলি কর্ণপাত না করে বলে গেল ওরা অভিনয়ের জানে কী, বোঝে কী? সিচুয়েশন মতো হাসতে জানে? কাঁদতে জানে?

মুখের একটা ভাঁজ বদলাতে পর্যন্ত হিমসিম খেয়ে যায়। আর রূপ! সে কথা আর নাই বা তুললাম। অহরহই তো দেখছেন। ওরা যে বিজ্ঞাপন দিয়েছিল, তাতে যারা দরখাস্ত করেছিল, তাদের দেখবেন? ওদেরই পাব্‌-লিসিটি অ্যাসিস্ট্যাণ্ট অমিয় নামে এক ছোকরা আমার কাছে দিয়ে গেছে ফটোগুলো। দেখুন একবার আপনার ভদ্রঘরের রূপসীদের নমুনা। মরে যাই, মরে যাই।

টেবিলের টানা থেকে একখানা খাম বের করল চামেলি, তারপর হাতের সব তাস চিৎ করে ধরার মতো ভঙ্গিতে সব কটা ফটো ছড়িয়ে দিল টেবিলের ওপর। 'এই দেখুন, সামান্য একটা ছবি তোলাতে গিয়েই যাদের মুখ কাঁদো কাঁদো হয়ে যায়, তাদের আবার প্লে করার শখ দেখুন একবার। ও কী, আপনার কী হল, ও রকম করছেন কেন।'

সামনের দেয়াল-আয়নার দিকে মণীন্দ্রের দৃষ্টি ছিল না, নইলে নিজের চেহারা দেখে নিজেই চমকে যেত। এলোমেলো বিশৃঙ্খল চুল, একটু আগেও কান দুটির গোড়া ঈষৎ রক্তাভ হয়েছিল, এখন একেবারে শাদা হয়ে গেছে। বিহ্বল, দৃষ্টিহীন চাউনির দিকে চেয়ে চামেলি ঠোঁট টিপে হাসল; মণীন্দ্রের মণি ফসফরাসের মতো জ্বলছে—দু'চুমুকেই এত! বললে, 'এই দেখেই মাথা ঘুরে গেল বুঝি। এইটুকু খেয়ে নিন, ঠিক হয়ে যাবে।'

চামেলি আবার একটা সোডা খোলবার উপক্রম করছিল, মণীন্দ্র ইঙ্গিতে নিষেধ করল। চেয়ারের হাতল ধরে উঠে দাঁড়িয়ে শুকনো গলায় বলল, 'এক গ্লাস জল খাব।'

'এনে দিই, দাঁড়ান।'

জল আনতে যেতে আর ফিরে আসতে যতটুকু সময় লাগল চামেলির, মণীন্দ্র তারই মধ্যে টেবিলের ওপর থেকে একখানা ফটো তুলে নিয়েছে, বুক পকেটে রেখে দিয়েছে সন্তর্পণে। চামেলি জলের গ্লাস ওর হাতে তুলে দিয়ে বলল, 'দেখলেন তো এদের, আর আমাকে তো রোজই দেখছেন। বলুন, এদের চেয়ে আমি ভালো পার্ট করতে পারব কি না। আপনার বই, আপনি একটু চাপ দিলে ওরা কি আপনার কথাটা না রাখবে।'

আসবার সময় চামেলি ড্রাইভার ডেকে গাড়ি বার করে দিতে চেয়েছিল, মণীন্দ্র বলেছিল প্রয়োজন নেই। নেশা তার ছুটে গেছে। একটা ট্যাক্সি সে নিজেই ডেকে নিতে পারবে। মাঝ রাতের ভিজে হাওয়ার ঝাপ্‌টা চোখে মন্দ লাগবে না।

গ্যাসের আলোর নিচে দাঁড়িয়ে মণীন্দ্র আর একবার ফটোটা বার করল। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে, সে কি শুধু শীতে। তিক্ত একটা হাসিতে মুখখানা একবার বিকৃত হয়ে উঠল। নিজে নিজে যখন নেশা করা যায়, তখন বোঝা যায় না কিছুই। আর একজন নেশাখোরের মুখোমুখি পড়লে তবে বোঝা যায় তার রূপ। মণীন্দ্রর জীবনের সমস্ত কুশ্রী কদর্যতা যেন হাতের মুঠোর একখানি আলোকচিত্রে প্রতিফলিত হয়ে আছে।

সেদিন কিন্তু গোয়ালার গলির ঠিক মুখটাতে শেষরাতের কাছাকাছি সময়ে দু'দিক থেকে দু'খানা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। ভাড়াটা চুকিয়ে দিয়ে মণীন্দ্র স্খলিত পায়ে এগোচ্ছিল, পেছনেও যে একজন আসছে টের পায়নি। নির্জন রাত, পায়ের জুতোর ঠোক্কর খাওয়া পীচের খস-খস শব্দ জিরজিরে বাড়িগুলোর দেয়ালে দেয়ালে ঘা খেয়ে ফিরে এসে লুটিয়ে পড়ছে ওর পায়ের কাছেই।

পিছনে ছায়াটা ততক্ষণ স্পষ্টতর হয়ে এগিয়ে এসেছে। থমকে দাঁড়াল মণীন্দ্র, পেছন ফিরে তাকাল। এমনি অতর্কিত ভাবে যে পেছনের ছায়ামূর্তি মুখ ঢেকে ফেলবে তারও উপায় নেই।

'তুমি ?'

'আমিই। কিন্তু তুমি এত রাত্তিরে কোথায় গিয়েছিলে শান্তি ?'

জবাব দিতে গিয়ে শান্তির কথা জড়িয়ে গেল। কঠিন একটা কথা বলবে বলে তৈরি হয়েছিল মণীন্দ্র, কিন্তু প্রাণহীন একটা হাসি বেরিয়ে এল। শান্তির পিঠে আলগোছে বার দুই আঘাত করে বলল, 'থাক, বানিয়ে বলতে হবে না। আমি জানি।'

গ্যাসের আলোর নিচে শান্তির মুখখানা উঁচু করে তুলে ধরে মণীন্দ্র বলল, 'কিন্তু চামেলি তোমার ফটোই শুধু দেখছিল, রক্ত-মাসের মানুষটাকে দেখেনি, তাই তোমার অভিনয়-কুশলতা সম্পর্কে সন্দেহ করেছিল। আজকে, এই মুহূর্তে এ অবস্থায় তোমাকে দেখলে কিন্তু চামেলিরও মত বদলাত। লজ্জা, ভয়, ঘৃণা, অভিমান, ক্ষোভ,—সব কিছুর এমন বিমিশ্র অভিব্যক্তি একখানা মাত্র মুখে ফোটাতে চামেলির মতো স্টেজ অ্যাকট্রেসের সাত জন্ম লেগে যাবে। কিন্তু তুমি সিনেমা তারকা হবার জন্যে উমেদারি করতে গিয়েছিলে কেন শান্তি ? না না না, ক্ষমা-টমা নয়—' শন্তিকে দু'হাত ধরে উঠিয়ে মণীন্দ্র বললে, 'আজ সারা সন্ধ্যে থিয়েটার দেখেছি, চামেলির ঘরেও এতক্ষণ থিয়েটার মন্দ হল না, আবার এখন, এই শেষরাতে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে প্লে করবার বা দেখবার শখ নেই আমার। দেখছ না, ভালো করে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছি না, কথাগুলো জড়িয়ে আসছে ? চলো, ঘরে যাওয়া যাক।'

দু'পা এগিয়ে গিয়ে আবার দাঁড়িয়ে পড়ল মণীন্দ্র। 'তা ছাড়া কে কার কৈফিয়ৎ তলব করে বলো। তুমি আমার, না আমি তোমার। দোষ তো আমারো কম নয় শান্তি।' বলতে বলতে মণীন্দ্র শান্তির কানের কাছে মুখ নামিয়ে নিয়ে এল, 'তার চেয়ে চলো, আমরা এখান থেকে পালিয়ে যাই। বরাবর তো আমরা এ রকম ছিলাম না ? ধরো এখানে আসবার আগে ? অভাব আগেও ছিল, কিন্তু এভাবে দুজনকে আলাদা করে দুপথে নিয়ে শেষ পর্যন্ত ঘুরিয়ে একই পথে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়নি। এই গলি আমাদের শেষ করে ফেলেছে শান্তি। এখানে আকাশ নেই, এখানে সহজ হয়ে বাঁচবার উপায় নেই। এই আবাহাওয়ায় আমাদের চিন্তা, কাজ সব কিছু অসুস্থ হয়ে

পড়ছে। বাঁচতে হলে এ গলি ছাড়তে হবে। হাওয়া বদল ছাড়া এ ক্ষয়রোগের চিকিৎসা নেই।'

ওরা চলে যেতে রাস্তার ধারের একটা জানালার কবাট সন্তর্পণে বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে এই নিভৃত দৃশ্যের একমাত্র দর্শকের মুখে একটুখানি হাসি খেলে গেল।

এরাও যাবে তবে, যাক। খোপে খোপে পায়রা এনে যিনি পুষেছিলেন, তিনিই আবার একে একে উড়িয়ে দিচ্ছেন সব ; কখনো বা জোড়ায় জোড়ায়। দিন। যাঁর পাখি তিনি ওড়াবেন, কিন্তু গোয়ালার গলির সামান্য স্বর্ণমণিকারের কিছু বলবার নেই। সে শুধু দেখেই যাবে।

১৪

এতদিন কেটে গেল এ-গলিতে, তবু নীলার এখনো মাঝে মাঝে নিজেকে এখানে প্রবাসী মনে হয়। এমন কি হতে পারে না, এর সবটাই স্বপ্ন ? এমন তো কত গল্পে পড়েছে, কত নায়ক নায়িকার অদৃষ্টে ঘটেছে বিচিত্র এই অভিজ্ঞতা। বছরের পর বছর কেটেছে বনের গহনে, পর্বত-গুহায় কি ধু-ধু মরুভূমিতে ; তারপর কখনো আচমকা ঘুম ভেঙ্গে দেখেছে সব ফাঁকি, সব মিথ্যে, কিছু ঘটেনি, বছর দূরে থাক, ঘণ্টাখানেকের বেশি ঘুমোয়নি।

নীলারও তো তেমন হতে পারে। কিন্তু গোয়ালার গলিতে ঘুমিয়ে ভোর হবে পপ্লার পার্কে। পাখির বুকের নরম বিছানায় শুয়ে আছে! এই গলির যত ধোঁয়া ধুলো আবর্জনা, সব স্বপ্নে এসেছিল, মিলিয়ে গেছে স্বপ্নেই। এই গলির যত মানুষ ? তাঁরাও মিলিয়ে গেছে বৈকি। প্রমথ পোদ্দার, শান্তি, মণীন্দ্র ; সেবাসত্রের মেয়ে ক'টি, ইন্দ্রজিৎ। এদের শুধু দুঃস্বপ্নে দেখেছে নীলা, সত্যি সত্যি এরা কোনদিন তার জীবনে আসেনি।

বিছানায় শুয়ে শুয়েই আলস্য ভাঙবে। হাই তুলে হাত বাড়িয়ে দেবে পাশে রাখা টেলিফোনটায়, বৌদির বাপের বাড়ি, তাকে খবরটা দিতে হবে।

'বৌদি বিকেলের এনগেজমেন্টটার কথা ভুলো না। কী বললে, সময় হবে না। বা রে আচ্ছা লোক তো তুমি। কথা দিয়ে এখন—। ভারি ইয়ে। ওদিকে মনন ঠিক তিনটের সময় গাড়ি নিয়ে আসবে। তুমি না গেলে বেচারাটার ভারি দুঃখ হবে মনে। 'কী বলছ, দুঃখ হবে না, খুশিই হবে মনে মনে ? কক্ষনো ও রকম ঠাট্টা করবে না বলছি বৌদি ; ভালো হবে না।'

কিন্তু কিনু গোয়ালার গলি তো স্বপ্ন নয়, আসলে পপ্লার পার্কটাই স্বপ্ন তবু কখনো কখনো ফিরে আসে ঘুমে, কিন্তু পপ্লার পার্ক নীলার এ-জীবনে আর আসবে না। বেণী দুলিয়ে ইস্কুলে যাবার সকালটি যেমন চিরদিনের মতো মিলিয়ে গেছে, তেমনি মিলিয়ে গেছে মনন-সৌম্য-মণীশের দল ; আসানসোলে মোটরগাড়ির গোধূলি। নীলার স্মৃতিতে এরা ছায়ার মতো এখন ; কৃষ্ণপক্ষের রাতে প্রান্তর-পাড়ি-দেওয়া ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখা

সারি সারি তার স্তম্ভের মতো ক্রম-পলায়ন, অস্পষ্ট।

কিন্তু শান্তিদি? প্রমথ পোদ্দার শকুন্তলা, ইন্দ্রজিৎ? এরা কি কখনো মুছে যাবে নীলার জীবন থেকে? ভরসা হয় না।

ইন্দ্রজিতের দরজায় মৃদু দু'টো টোকা দিলে নীলা। ঘরের ভেতর আছে নিশ্চয়ই।

'এসো।' ইন্দ্রজিৎ কী লিখছিল, মুখ তুলে স্মিত অভ্যর্থনা জানালে। 'কলেজ থেকে ফিরলে কখন?'

দরজাটা আস্তে আস্তে ভেতর থেকে ভেজিয়ে দিল নীলা। 'যাইনি তো। কলেজের খাতা থেকে নাম কাটা গেছে।'

'গানের স্কুল?'

'তাও নেই। জানো না, মাসোহারা বন্ধ হয়ে গেছে।'

অকৃত্রিম হাসিতে ইন্দ্রজিতের মুখ ভরে গেল। 'ভালোই হয়েছে। আমারো পড়াশোনা বন্ধ হয়েছে, তোমারো হল।'

নীলার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির ইঙ্গিত লক্ষ্য করে ইন্দ্রজিত টেবিল থেকে একটা চিঠি তুলে বললে, 'বাবা লিখছেন। তাঁর এখন হাত টানাটানি চলছে, প্র্যাকটিস মন্দা; অকর্মণ্য ছেলেটিকে আর কলকাতা বসে ব'য়ে যাবার ট্যাক্সো যোগাতে পারবেন না। তাড়াতাড়ি আমাকে একটা কিছু খুঁজে নিতে বলছেন।'

একটু থেমে আবার বলল, 'বাবাকে দোষ দিই না, কিন্তু আমি এখন করি কী। বিধাতাপুরুষ ষষ্ঠীর দিনে কপালে যা লিখে দিয়েছিলেন, অদৃষ্টে তাই আছে জেনে এতদিন নিশ্চিন্ত হয়ে বসেছিলাম, এবার দেখছি সেই লেখাটার পাঠোদ্ধার করতেও অন্তত ছোটোছুটি করতে হবে। সাধুভাষায় যাকে বলে জীবন-সংগ্রাম। কথাটা শুনতে জমকালো, কিন্তু ওর চেহারাটা বড়ো বিশ্রী নীলা; ওর মানে হল দোরে দোরে উমেদারি, দরখাস্ত ফিরি, অতি অযোগ্য লোকের কাছে মাথা হেঁট, উসকো চুল, শুকনো মুখ, চিমসে পেট—আরো ফিরিস্তি শুনবে?'

নীলার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছিল ইন্দ্রজিৎ। চোখ দুটোর ওপর চেপে ধরে রেখেছিল দ্রুতরক্তচঞ্চল একখানা হাত। আস্তে সেই হাতখানা ইন্দ্রজিৎ টেনে আনল নাসাগ্রে, যেখানে ঈষদুষ্ণ নিশ্বাস বইছে; তারপর টেনে নিয়ে গেল আরো সামনে; ভিজে দু'টি ঠোঁটের ওপর অনেকক্ষণ ধরে রেখে বলল, 'কী শান্তি।'

কী একট প্রগাঢ় পরিতৃপ্তি ছিল ওই শব্দ দুটি উচ্চারণে, নীলার বুক থেকে পায়ের নখ অবধি একট সর্পিল শিহরণ বয়ে গেল। একটা ভুলে যাওয়া কথা হঠাৎ মনে পড়ার মতো চমকে উঠল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বলল, 'শান্তিদিরা তো চলে যাচ্ছেন শুনলাম।'

ইন্দ্রজিৎ চোখ মেলে তাকাল। 'তাই নাকি। কই আমি কিছু শুনিনি তো। মুশকিল আরেকটা বাড়ল তাহলে। শান্তি এতদিন তবু 'মীল'টা বন্ধ

করেনি, এবার থেকে আবার হোটেলে গিয়ে ধন্না দিতে হবে।'

ইন্দ্রজিতের গলায় ঠাট্টা ছাড়া আর কিছু ছিল না, তবু আস্তে আস্তে হাতখানা টেনে নিলে। গলায় যাই থাকুক, ইন্দ্রজিতের মুখখানা যে শুকিয়ে গেছে, তা তো নীলার চোখেই ধরা পড়েছে। শুধু হোটেলে খাবার ভয়েই কি পলকে এমন বিবর্ণ হয় কেউ, না হতে পারে?

'আমি যাই।' বললে আস্তে আস্তে। 'ওপরে মার অসুখ। একা আছেন।'

সে কথা ইন্দ্রজিতের কানে গেল কিনা সন্দেহ। জিজ্ঞেস করল, 'ওরা কবে যাবে জানো?'

'আজকালের মধ্যেই সম্ভবত। ঠিক বলতে পারব না তো। তবে শান্তিদিকে জিনিসপত্র গোছগাছ করতে দেখেছি।' ইন্দ্রজিতের মাথাটা নামিয়ে দিয়ে নীলা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। দরজা পর্যন্ত গিয়ে ফিরে তাকাল একবার। ইন্দ্রজিৎ নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে আছে। নীলা বাইরে এসে দরজাটা ভেজিয়ে দিলে।

সেই চোখ বন্ধ করেছিল ইন্দ্রজিৎ খুলল আরো আধ ঘণ্টা পরে। দরজাটা বাইরে থেকে কে বুঝি খুলেছিল, মরচে-পড়া কব্জা ক্ষীণ শব্দ করেছিল একটু। ইন্দ্রজিৎ বঝুতে পেরেছিল ঘরে কেউ ঢুকেছে। জিজ্ঞাসা করল, 'কে?'

সহসা কে নিবু নিবু হারিকেন শিখাটাকে উজ্জ্বল করে দিলে। সদ্যমেলা চোখ দুটো জ্বালা করে উঠল। ইন্দ্রজিৎ তাকিয়ে দেখল, শান্তি।'

প্রথম সূর্যোদয়ের রঙ কপালের প্রগাঢ় টিপ্‌টিতে, ফিকে নীল শাড়ির ছোট ঘোমটাটুকু আকাশের মতো আনত; চোখের মণি দু'টিতে দ্রুতবিলীয়মান রাত্রির শেষ কালোর রেশ। ইন্দ্রজিৎ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল।

সমস্ত অস্তিত্ব জুড়ে একটা সাড়া জেগেছে, অসংখ্য রক্তকণিকায় স্পর্শ-তৃষ্ণা; ভয় ভালোবাসা অভিমান সব প্রথম বর্ষার জোয়ারের মতো। মনের আনাচে কানাচে, আঙিনায়, দেহের কানায় কানায় ভরে গেছে।

এ তো তবু সান্নিধ্য শুধু, স্পর্শ নয়। একটু আগেও তো একজন এখানে ছিল তাকে নিবিড় করে ঘিরে; তার হাতখানি নিয়ে খেলাও করেছিল ইন্দ্রজিৎ, রেখেছিল অবিন্যস্ত চুলে, জ্বরশুষ্ক কপোল, পিপাসাতপ্ত ঠোঁটে। কিন্তু তখন তো সত্তাময় এমন আলোড়ন ওঠেনি; নম্র, শান্ত, সজল একটা অনুভূতিতে দেহময় আচ্ছন্ন হয়েছিল।

কিন্তু যে-মুহূর্তে এল শান্তি সেই হঠাৎ উসকানো হারিকেনের শিখার আলোকিত মুহূর্তটির সঙ্গে কি তার সামান্য তুলনাও হয়! সব গোলমাল হয়ে গেল; শুকনো তৃণগুচ্ছ যেন হঠাৎ আগুনে জ্বলে উঠল; ঢেউ-এর পর ঢেউ এসে বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে চেতনা, মাথা তুলে চাইবার ফুরসৎ নেই; এই ঢেউ নেমে যাবে যখন, রেখে যাবে একটা লবণাক্ত স্বাদ; রোমাঞ্চের স্বেদ।

ইন্দ্রজিৎ ভুলে গেল, শান্তি ওর ঘরে অনেকদিন আসেনি; শান্তি ওকে অপরিণত বালকের চেয়ে বেশি মূল্য দেয়নি; শান্তি ওকে নিষ্ঠুরভাবে রস-

নিঃশেষ পাত্রের মতো ফেলে দিয়েছে। বলল, 'অনেকদিন পরে এলে।'

'অনেকদিন পর', বলল শান্তি; ইন্দ্রজিতের গলায় কথাটা ভাঙা ভাঙা শুনিয়েছিল, শান্তির গলায় যেন বেজে উঠল।

'শুনলাম, তোমরা নাকি চলে যাচ্ছ।'

'যাচ্ছি।' শান্তি বলল, 'সেই কথাই তোমাকে বলতে এলাম। তুমিও যাবে তো।'

'নাঃ, আমি আর কোথায় যাব।'

শান্তি হেসে উঠল। 'বুঝেছি, এ-বাসা তুমি ছাড়তে চাও না। কিন্তু গোয়ালার গলির এই অন্ধকার খোপ কি তোমার এতই ভালো লেগে গেল ইন্দ্রজিৎ।'

'ভালো লাগেনি; তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাইনে শান্তি, কিন্তু ভালো না লাগলেও আমরা অনেক কিছু মেনে নি। কিন্তু গোয়ালার গলিকেও আমি তেমনি মেনে নিয়েছি।'

একটু থেমে ইন্দ্রজিৎ আবার বলল, 'তা ছাড়া তোমার পেছন পেছন আমি কোথায় যাব। তুমি হয়ত বাসা পেয়েছে দক্ষিণ উপকণ্ঠের একটি পরিচ্ছন্ন, নিভৃত কুটিরে; লব্ধপ্রতিষ্ঠ কীর্তিমান স্বামী; সুবিস্তৃত সাচ্ছল্য। সেখানেও আমি যদি সঙ্গে সঙ্গে লেগে থাকি শান্তি, সেটা কারুর ভালো ঠেকবে না। অনধিকার প্রবেশের মতো মনে হবে। আমি তো তোমার শুধু অতীত, শান্তি। তোমাকে শুধু এই গলির জীবনের কথা মনে পড়িয়ে দেবে, যখন তোমার আঁচলে বা ক্যাশবাক্সে একটি টাকাও থাকত না, আমাকে দেখলে তোমার বাজী রেখে তাস খেলার কথাই মনে পড়বে।'

শান্তি হাসল। 'তা হলে যেয়ো না। আমি কিন্তু অতসত ভেবে বলিনি ইন্দ্রজিৎ। বড়ো একটা বাসা ঠিক হয়েছিল, দশ-বারোখানা ঘর, একখানা নিয়ে তুমি স্বচ্ছন্দে থাকত পারতে, বাঁচতে পারতে। এখানে তুমিও তো মরে যাচ্ছ ইন্দ্রজিৎ; এই অসাচ্ছল্য অপ্রচুর আলো হাওয়ার মধ্যে নিরন্তর বন্দিত্ব, একে তো বাঁচা বলে না।'

'আমি বাঁচতে চাইও না।' ইন্দ্রজিৎ চোখ ঢেকে বললে।

অনেকক্ষণ পর চোখ খুলল যখন, শান্তি চলে গেছে; যাবার সময় ভালো করে দরজাটা টেনেও দিয়ে যায়নি, স্যাঁতসেঁতে উঠোনের নর্দমা থেকে বিশ্রী একটা শিরশিরে শীত আর দুর্গন্ধ আসছে। কোন ঘরে কারা আঁচ দিয়েছে উনুনে, কাঁচা কয়লায় ধোঁয়ায় সমস্ত ঘর ভরে গেছে।

সমস্ত মন বিষিয়ে উঠল ইন্দ্রজিতের। এই তো শান্তি। ভালোই হয়েছে, চলে গেছে। কী অহঙ্কারী; কী অন্তঃসারশূন্য। হঠাৎ ইন্দ্রজিৎ আবিষ্কার করল, শান্তিকে সে ঘৃণা করে। ওর চলা-বসা কথা বলা সব কিছুর একটা ব্যঙ্গ-বিকৃত রূপ যেন চোখের সমুখে ভাসতে লাগল—কী স্থূল, কী নিরুচি। এই টাকার সাচ্ছল্যের স্বপ্নবিভোর মেয়েটা তাকে শুধু ঠকিয়ে গেছে। ইন্দ্রজিতের জন্যে যার মনে এক কণা করুণা নেই, তাকে যে সে শেষ পর্যন্ত

ঘৃণা করতে পারছে, সে কথা ভেবেও ওর মনের অনেকখানি তাপ যেন জুড়িয়ে গেল।

কালকেই ওরা চলে যাবে। বেঁচে গেছে যে এত সহজেই জের মিটে গেল। শান্তি ওকে পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু ও নিরাশ্রয় নয়। নীলা আছে। আঃ, একথা যদি শান্তিকে মুখের ওপর বলতে পারত নীলা আর শান্তি। কিসে আর কিসে। গভীর অনুভূতিতে ইন্দ্রজিতের মন ভরে গেল। নীলা ওকে বাঁচিয়েছে। এই প্রায়-নীরব মেয়েটির মমতাস্নিগ্ধ চোখ দুটির তুলনা নেই। নীলাকে সে যে এত ভালোবাসে, শান্তিকে ঘৃণা করে, এ-কথা এতদিন ওর নিজের কাছেও অজানা ছিল কী করে। নীলাকে নিয়েই ইন্দ্রজিৎ বেঁচে উঠবে। কিছুই হারায়নি, কিছুই ফুরোয়নি, এখনো অফুরন্ত ভবিষ্যৎ সামনে।

উঠে গিয়ে ইন্দ্রজিৎ দরজাটা বন্ধ করে দিতে গেল। শান্তিদের ঘরের কপাটের ফাঁক দিয়ে তীব্র একটা রশ্মি ছুরির মতো বিঁধছে চোখে। ঘরের ভেতর বাক্স টানাটানির আওয়াজ। ওদের যাবার আয়োজন বোধকরি সম্পূর্ণ হয়ে এল।

আজ যে ঘরে এত শব্দ, এত আলো, কাল সে ঘরখানা খালি হয়ে যাবে, মনে হতেই ইন্দ্রজিতের মন নিস্তেজ হয়ে এল। কাল এমন সময় ও-ঘরখানা অন্ধকার; একটা টুকটাক শব্দও নেই; সমাধির মতো নিঃশব্দবধির পরিবেশে একা-একা এ-ঘরে কী করে থাকবে ভাবতেই গা ছমছম করে উঠল। এই শেষের কিছুদিন অবশ্য বিশেষ কিছু সম্পর্ক ছিল না ওদের সঙ্গে; নিয়মিত সময় খাবার আসত; তা-ছাড়া ওরা কখন আসত যেত টেরও পায়নি ইন্দ্রজিৎ। চোখের সম্মুখে ছিল না, তবু আছে, এই সচেতনা ছিল। শান্তির অস্তিত্বের অনুভব ছিল।

ভালোই হয়েছে, কাল আর এই অনুভূতিটুকুও থাকবে না। একেবারে নতুন, ধোওয়া মেজেয় নতুন আলপনা। তবু যথোচিত উৎসাহ আসে কই। যাকে দেখতে পারে না, যার চলা-বসা-কথা রুচিহীন মনে হয়, তারই আসন্ন বিচ্ছেদের কল্পনাটুকুও এমন ম্রিয়মাণ করে কেন।

হঠাৎ একটুখানি হাওয়ায় ওদের দরজাটা সামান্য ফাঁক হয়ে গেল; সেই আলোর রশ্মিটা শতগুণ বিস্তৃত হয়ে ইন্দ্রজিতের চোখে মুখে ঝলসে পড়ল। দরজার সমুখে হালকা রঙের সেই পর্দাটা; ইন্দ্রজিৎ জানে, ওটা শান্তিরই একটা পরিত্যক্ত শাড়ি দিয়ে তৈরি।

সেই পর্দার আড়ালে, লঘু পায়ে শান্তি চলাফেরা করছে; রক্তমাংসের যেন নয়, একটা ছায়ার মতো। বাক্স টানছে, কাপড় গোছাচ্ছে, চাবির রিং না হাতের চুড়ি বাজছে। ইন্দ্রজিৎ সম্মোহিতের মতো দেখতে লাগল।

শান্তিকে সে এখনো ভালোবাসে। কাউকে পছন্দ না করেও ভালোবাসা যায়, ইন্দ্রজিৎ প্রথম জানল।

অনেক রাতে আরেকবার দরজাটা সন্তর্পণে কে খুলল। ইন্দ্রজিৎ জানে, কে। এ এসেই হঠাৎ হারিকেনের আলো উসকে দেয় না, এর না আছে আঁচলে

চাবির রিং, না আছে কৃশ হাত দুটিতে বাজবার মতো চুড়ি। নিঃশব্দ পায়ে আসে। অনুভব,—শুধু অনুভব দিয়েই বিছানাটা কোথায় টের পায় ; একেবারে ধার ঘেঁষে দাঁড়ায়। ইন্দ্রজিৎ জানে কে।

দু'হাতের কৃতজ্ঞতা দিয়ে তাকে বেষ্টন করে ইন্দ্রজিৎ কাছে টেনে আনল। কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'শাস্তি এসেছিল। তুমি ঠিকই বলেছিলে, ওরা কাল চলে যাবে। দশ-বারোখানা ঘর, শুনিয়ে গেল। তা যাক। তুমি এসো।'

১৯

পরদিন ইন্দ্রজিতের ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। ছেলেবেলায় অনেকবার এরকম হত। সারারাত যাত্রাগান শুনে শেষরাতে ফিরে এসে সারা সকাল ঘুমোত। ঘুম ভেঙেও দেখত, গা-হাত-পা ব্যথা ব্যথা, চোখ-মুখ অল্প অল্প লাল, ফোলা, অবসাদ যায়নি।

আজও তেমনি মনে হচ্ছে। কাল সারারাত ধরে কারা যেন এ-ঘরে আনাগোনা করেছে, এখন শুধু স্বপ্নের মতো মনে হয়। বালিশে, ইন্দ্রজিতেরই বালিশে, মৃদু একটা তেলের সৌরভ মিশে আছে ; এ তেল ইন্দ্রজিৎ কখনো মাখে না। দীর্ঘ দু'একগাছি চুল ; এত বড়ো চুল ইন্দ্রজিৎ রাখে না। আর ছোট্ট একটা টিপ অস্ত যাওয়া চাঁদের মত বালিশ থেকে গড়িয়ে চাদরে পড়েছে। অলস আঙুলে ইন্দ্রজিৎ সেটা তুলে নিল ; কৌতূহলের সঙ্গে চোখের সমুখে এনে দেখতে লাগল!

এ-টিপ যার, শেষরাতে সে বিছানা থেকে পা টিপে টিপে নেমে গিয়েছিল। সন্তর্পণ হাতে খুলেছিল শিয়রের জানালা ; এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়ায় আর ভোরের আলোয় ঘর ভরে গিয়েছিল। এ গলির এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার, চারধারে এত কড়াকড়ি, নিষেধের দেয়াল, তবু আলো হাওয়ার চোলাই কারবার চলেছে। ঠিক ফুরসুৎ পেলেই হাওয়া এসে ঘরে ঢোকে, ফাঁক পেলেই আলো এসে গড়ায়। তারপর থেকে এই এত বেলা পর্যন্ত ইন্দ্রজিৎ বিভোর হয়ে ঘুমিয়েছে। শিয়রের জানালা যে খুলে দিল, হাত বাড়িয়ে তাঁর আঁচলটা ধরবার একটা চেষ্টা করেছিল মনে পড়ে, কিন্তু ঘুমে অবশ হাত, নাগাল পায়নি।

কুঁজোয় জল ছিল ; নর্দমার সমুখে গিয়ে ইন্দ্রজিৎ চোখে জলের ঝাপটা দিলে। তারপর দাড়ি কামিয়ে তৈরি হল। একবার বেরুতে হবে। কত বেলা এখন দশটা—এগারোটা? সারা ঘরময় ছায়া-ছায়া, নিস্তেজ আলোয় দিনের বয়স ঠাহর করা যায় না।

বেরিয়ে এসে, সিঁড়ির কোণে, সামনের দরজার দিকে তাকাতেই ইন্দ্রজিতের দৃষ্টি স্থির হয়ে গেল। বাইরে থেকে শিকল তোলা, শিকলের ওপর একটা তালা ঝুলছে।

ওরা তা হলে চলে গেছে।

শেষ পর্যন্ত ওরা যাবে না, হয়ত শান্তির মত বদলাবে গোপন মনে এমনি একটা ক্ষীণ আশা যে লালন করে এসেছে, সেটা ইন্দ্রজিৎ টের পেল এতক্ষণে। চোখের পাতা দুটো জ্বালা করে উঠল। এত নীচ, এত স্বার্থপর শান্তি? চোরের মতো পালিয়ে গেল, যাবার সময় একবার জানিয়েও গেল না ইন্দ্রজিৎকে? মনে মনে পরিমাণহীন একটা অভিমান উদ্বেল হয়ে উঠল; যেন, শান্তি চলে গেছে সেটা বিশেষ কিছু নয়, যাবার সময় বলে গেলেই ইন্দ্রজিতের কোন ক্ষোভ থাকত না।

কোন কারণ নেই, তবু লোভ হল, একবার এগিয়ে যায়, উঁকি দিয়ে দেখে, কী আছে ভিতরে। নিজের ঘরে তালা দিল ইন্দ্রজিৎ।

খুট করে শব্দ হল, বোধ হয় হাওয়ার। এখন দুপুর, কোথা থেকে শুকনো একরাশ পাতা উড়তে উড়তে এসে পড়ল উঠোনে। শিকল তোলা, তবু শান্তিদের দরজার মুখটা একটুখানি হাঁ হয়ে গেল। ইন্দ্রজিৎ তাকিয়ে দেখল ভেতরটা অন্ধকার।

অন্ধকার। সমস্ত সম্পর্কের নিবিড়তা সমস্ত পরিচয়ের গভীরতার ওই শেষ। যে ঘরখানা একদিন এত প্রিয় ছিল ইন্দ্রজিতের, যাবার সময় শান্তি সেটাকে অন্ধকারে বোঝাই করে রেখে গেছে, শেকল টেনে ঝুলিয়ে দিয়েছে তালা; কঠিন লোহার অক্ষরে, কাঠের ফলকে লেখা এপিটাফ।

আরেকবার নড়ে উঠল কাঠের দরজাটা; চৌকাঠের ভিতর থেকে একটা দুর মাথা গলিয়ে বাইরে আসতে চেষ্টা করছে। মজ্জায় মজ্জায় একটা হিম ঘৃণা শির শির করে বয়ে গেল। আস্তে আস্তে সরে এসে ইন্দ্রজিৎ বাইরের রাস্তায় পা দিলে।

আঘাতের প্রথম মুহূর্তটিতে ইন্দ্রজিৎ বিহ্বল হয়ে পড়েছিল। মুষ্টিযুদ্ধে মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার মতো। শুধু দৈহিক যন্ত্রণা নয়, মানসিক অপমানবোধও। উদ্দেশ্যহীনভাবে সেদিন রাস্তায় রাস্তায় একা একা কত ঘুরেছিল হিসেব নেই। পার্কে এসে বসেছিল অনেকক্ষণ। কিছুই ভাবছে না, ভাবতে ইচ্ছেও করছে না, তবু মাথাটা ভারি হয়ে আছে। চুপ-চাপ বসে থাকতেও ভালো লাগছে না, অথচ এর চেয়ে কী যে ভালো লাগবে, তা-ও জানা নেই। পালাক্রমে চীনে বাদাম, জুতো পালিস, মাথার মালিশওয়ালারা এদিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল; ইন্দ্রজিতের ইচ্ছে হল সবাইকেই ডাকে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কাউকেই ডাকা হল না। কতকগুলো পিঁপড়ে ওকে চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করে একটা গাছের গুঁড়ির দিকে মিছিল করে চলেছে; অন্য সময় হলে ইন্দ্রজিৎ সরে বসত; এখন শুধু নিমেষহীন অলস চোখে দেখে যেতে ইচ্ছে করছে। মাথার ওপর টুপ করে কী পড়ল; ইন্দ্রজিৎ তাকিয়ে দেখল একটুকরো হাড়; কাক-চিলের অন্যমনস্ক ঠোঁট থেকে পড়ে গিয়ে থাকবে।

বেলা গড়িয়ে এল। সূর্যের আলো এখন একেবারে মুখোমুখি।

লোকের ভিড় বাড়ছে। একজন দু'জন একজন দু'জন ক'রে ঢুকছে ভেতরে সবশুদ্ধ ক'জন এল একবার গুণতে চেষ্টা করল ইন্দ্রজিৎ, পারল না। সবলোক কেমন একাকার হয়ে যায়, একই লোক গোণা হয়ে যায় বার বার করে। কতগুলো লোক যে বার বার ফিরে ফিরে আসছে সন্দেহ নেই। পার্কটাকে চক্কর দিচ্ছে বোধ হয়। স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ী প্রৌঢ়রা জাঁকিয়ে বসেছেন সারে সারে বেঞ্চিতে ; কমবয়সী ছেলেরা খেলা সাঙ্গ করে বল কুড়িয়ে নিয়ে চলেও গেল। গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে ডিমের ডালনা ঘুগনিওয়ালা তার বেসাতি সাজিয়ে বসেছে ; একটু দূরে কয়েকটি কলেজের ছেলে প্রশ্নপত্রের আলোচনায় নিমগ্ন। রাস্তার পাশের চায়ের দোকানের রেডিওতে প্রথম সান্ধ্য-খবরের ঘোষণা।

তারপর প্রৌঢ়রা চলে যেতে শুরু করলেন একে একে। ভিড় ফিকে হয়ে আসছে ক্রমে ক্রমে। যেন এক ঠাঁই বসে থেকে একই নদীতে জোয়ার ভাঁটা দেখছে ইন্দ্রজিৎ।

হঠাৎ হালকা গলায় চাপা হাসির শব্দ শুনে ইন্দ্রজিৎ সোজা হয়ে বসল। পাশের ঝোপটার আড়ালে একটু আগেই যে দু'জন তার দিকে একটু সন্দিগ্ধ একটু কৌতূহলী চোখে তাকাতে তাকাতে গিয়ে বসেছিল, সেটা ইন্দ্রজিতের নজর এড়ায়নি। তারপর আবার কখনও অন্যমনস্ক হয়ে ওদের অস্তিত্ব ভুলে ছিল। এতক্ষণ পরে এই হাসির শব্দ এসে ওর মস্তক বিহ্বল চেতনায় আগুন ধরিয়ে দিল। কী কুৎসিত, বিশ্রী, মেয়েদের এই হঠাৎ খুশি হওয়া, এই খোলা গলার হাসি।

ইন্দ্রজিৎ উঠে দাঁড়াল। হিম পড়তে শুরু করেছে। সেজন্যে নয়। পাশের ঝোপের আড়াল থেকে থমকে থমকে আসা এই হাল্কা গলার হাসি সহ্য হচ্ছে না।

বাসায় ফিরে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে ইন্দ্রজিৎ ও-পাশের দরজার দিকে তাকাল। যে অন্ধকারগুলোকে ঘরের ভিতর বন্দী করে রেখে গিয়েছিল শান্তি, তারা কখন দরজার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে ; ভেতরে বাইরে এখন একাকার, কিছু দেখা যায় না ঃ শিকলে ঝোলানো ভয়ে ঠক ঠক করে কাঁপা তালাটাও না। চৌকাঠের ফাঁক দিয়ে সেই ভীরু ইঁদুরটা এখনো কুৎকুতে উৎসুক চোখে চেয়ে আছে কি না কে জানে।

ঘরের ভেতর পা দিতেই অবাক হয়ে গেল। ফস করে দেশলাই জ্বালিয়েছিল, পথ ঠিক করতে, কিন্তু পথ দেখার আগে দেখতে পেল নীলাকে।

আরেকটা কাঠি জ্বালিয়ে হারিকেন ধরাতে হল।

বালিশে মুখ গুঁজে, আধ-শোয়া উপুড় হয়ে ছিল নীলা, ফিরে তাকাল। 'এই এতক্ষণে ফিরলে। আমি সেই কখন থেকে বসে আছি।'

একটুখানি অভিমান, একটুখানি খুশি। ইন্দ্রজিতের মনে হল, এত সুন্দর নীলাকে সে কখনো দেখেনি। যত্ন করে পরা ফিকে রঙের একখানা শাড়ি। সবচেয়ে অবাক লাগল টুকটুকে ঠোঁট দুটি দেখে।

'তুমি পান খাও বুঝি ?'

'খাই না তো,' নীলা মুখ তুলে ধরে বলল, আজ শুধু একটা খেয়েছি। কিন্তু তুমি এত দেরী করলে কেন?'

আজ সারা বিকেল নীলা এই ঘরের মেজে ঝাঁট দিয়েছে, পরিপাটি করে পেতেছে বিছানা। টুকটাক যা ছিল এখানে ওখানে ছড়ানো, সব গুছিয়েছে। টেবিলে খাবার ঢাকা।

'কার জন্যে?' ইন্দ্রজিৎ জিজ্ঞাসা করল, যদিও প্রয়োজন ছিল না।

'তোমার। আজ থেকে তুমি আমাদের সঙ্গে খাবে।'

কৃতজ্ঞতায় আবেগে, অভিভূত হয়ে পড়ল ইন্দ্রজিৎ। এই স্বল্পালোক ঘরে, রাত্রির দ্বিপ্রহর স্তব্ধতায় কী মহীয়সী মনে হচ্ছে নীলাকে। কিছুক্ষণ আগে সব কিছু শূন্য পাত্রের মতো নিঃশেষে মনে হয়েছিল, আবার সব কানায় কানায় ভরে উঠেছে। যে মুহূর্তটিতে মৃত্যুনীল হয়ে পড়েছিল, সেই মুহূর্তেই যে সঞ্জীবনী এনে ধরেছে ওষ্ঠপুটে, তার কাছে ইন্দ্রজিৎ জীবনের ঋণে বিকিয়ে আছে।

দিনকতক ঘোরাঘুরির পর ইন্দ্রজিৎ শেষ পর্যন্ত একটা চাকরি ঠিক করে ফেলল! সামান্য কাজ, মাইনে সামান্যতর। একটা প্রেসে প্রুফ দেখতে হবে। মাসান্তে পঁচিশ টাকা। কিন্তু বসে বসে খেতে আত্মসম্মানে বাধে; নীলার দাক্ষিণ্য যতই হোক, ইন্দ্রজিৎ তো জানে ওদের সামর্থ্য কতখানি। নিজে আধপেটা খেয়ে নীলা ওর জন্যে খাবার বয়ে আনছে কিনা ঠিক নেই।

চাকরির কথা শুনে যতটা উৎসাহিত হয়েছিল নীলা, মাইনের অঙ্ক শুনে ততটাই মিইয়ে গেল।

'এ কাজ কি তোমার উপযুক্ত?'

ইন্দ্রজিৎ হাসল। 'যাঁরা কাজে বহাল করলেন, তাঁদের মনের প্রশ্নটা কিন্তু আলাদা রকমের নীলা। তাঁদের সন্দেহ ছিল, আমি এ কাজের উপযুক্ত কিনা। অভিজ্ঞতা নেই, মাইনে ঠিক করতেই চান না। মাস তিনেক শিখে নিতে বলেছিলেন। অনেক পেড়াপিড়ির ফলে ওই ক'টা টাকা কবুল করেছেন।'

প্রেসের মালিক প্রভাকরবাবু পরদিন সকাল সকাল যেতে বলেছিলেন। কাজের মোটামুটি পদ্ধতিটি শিখিয়ে দেবেন আর দু'চারজন সহকর্মীর সঙ্গে।

ইন্দ্রজিৎ একটু বেশি সকাল সকালই গেল। তখনও ছাপাখানার দরজাই খোলেনি। ভালো করে খেয়েও আসতে পারেনি, এত তাড়াতাড়ি না এলেও পারত। এদিক ওদিক কিছুক্ষণ ঘুরল ইন্দ্রজিৎ; একটা চায়ের দোকানে চা খেল। বার বার দেখতে লাগল ঘড়ির দিকে।

পরের বার যখন ঘুরে এল, তখন জন দুই তিন কম্পোজিটার মাত্র এসেছে। ইন্দ্রজিৎ যেতেই একজন এগিয়ে এল। খাতির করে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করল, কোন অর্ডার আছে কিনা।

সে যে নতুন কাজে বহাল হয়েছে, এ কথাটা এদের কাছে হঠাৎ স্বীকার

করতে ইন্দ্রজিতের কেমন বেধে গেল। অপ্রস্তুতের মতো বলল, 'প্রেসের মালিক প্রভাকরবাবুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।'

হেড কম্পোজিটার নিবারণ চশমার ফাঁক দিয়ে ওকে খুঁটিয়ে দেখে নিচ্ছিল। একটা চেয়ার টেনে দিয়ে বলল, 'বসুন। এখুনি এসে পড়বেন।'

এখুনি নয়, প্রভাকরবাবুর আসতে আরো প্রায় ঘণ্টা দেড়েক লাগল। ইন্দ্রজিৎকে দেখে বললেন 'এই যে এসে গেছেন দেখছি। আমার একটু দেরি হল। পথে গাড়িটা বিগড়ে আবার—। আসুন এদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই।'

ওদিকে একটা টেবিলে ইতিমধ্যেই দুজন লোক এসে বসেছিল। প্রভাকরবাবু ইন্দ্রজিৎকে নিয়ে তাদের পাশে বসিয়ে দিলেন। 'শশিপদবাবু, ইনি আজ থেকে কাজে যোগ দিলেন। এঁকে মোটামুটি কাজটাজ সব দেখিয়ে দিন।' বলেই, প্রভাকর আর বসলেন না, কাজের চাপ, অন্যদিকে চলে গেলেন।

প্রভাকর আড়াল হতেই শশিপদ হাতের প্রুফটা একদিকে সরিয়ে রাখল। পাশের ছেলেটি, যে এতক্ষণ কপি ধরেছিল, তাকে একটা পয়সা দিয়ে বলল, 'যা তো নকুল, চট করে একখিলি পান নিয়ে আয়। বাংলা। দোক্তা আলাদা আনবি।'

পকেট থেকে নস্যি বার করে পরিপাটি একটা টিপ নাকে গুঁজল। হাঁচল ধীরে সুস্থে কয়েকবার। তারপর একটা কুটকুটে ময়লা রুমালে নাক ঝেড়ে, নস্যির কৌটো ইন্দ্রজিতের দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'চলে নাকি?'

ইন্দ্রজিৎ ঘাড় নাড়ল। শশিপদ তখন পকেটে হাত দিয়ে বলল, 'বিড়ি?' ইন্দ্রজিৎ এবারেও লজ্জিত ভঙ্গিতে অস্বীকৃতি জানাল।

'ও, গুড বয়।' বিড়িতে ফুঁ দিয়ে দেশলাই জ্বালাতে জ্বালতে শশিপদ বলল। 'তা সাইন টাইনগুলো জানা আছে?

ইন্দ্রজিৎ চট করে বুঝতে পারল না। 'কিসের সাইন?'

শশিপদ বিরক্তিতে মুখ কুঞ্চিত করে বলল, 'সাইন জানেন না, প্রুফ রীডার হয়ে এসেছেন? বলি প্রুফ দেখবেন যে, মার্জিনে চিহ্ন বসাবেন তো?'

'সে তো জানি, কিছু কিছু।'

'কিছু কিছু নয় মশাই, ভালো করে জানতে হবে। এই নকুলে, আজ ছ' বচ্ছর ধরে ধরো লক্ষ্মণের মতো কপি ধরেই আছে। ও পারল প্রুফরীডার হতে? কাজ বড়ো সোজা নয় মশাই, ট্রেইন্ড, আই চাই; বাংলা-ইংরিজি কন্সট্রাক্শন সম্বন্ধে থরো নলেজ চাই—'

নকুল ইতিমধ্যে পান নিয়ে এসেছিল। খিলিটা মুখে পুরে দিলে শশিপদ; আলগা করে জর্দার টুকরোগুলো পরীক্ষা ক'রে ঢেলে দিলে জিভে; তারপর উঠে গিয়ে খানিকটা পীচ রাস্তায় ফেলে দিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'তা আপনাকে কত দেবে বলেছে মশাই?'

অঙ্কটা এতই কম যে ইন্দ্রজিতের বলতে বাধল। কিন্তু অফিসের সহকর্মীর কাছে বাড়িয়ে বলে পার পাওয়া দুষ্কর। বললে, 'খুবই কম। বলেছে

আপাতত পঁচিশ টাকা।'

চোখ আর চশমা একই সঙ্গে কপালে তুলে ফেলল শশিপদ। 'কম বলছেন কি মশাই, প্রভাকর বড়ালের কাছ থেকে খুব দাঁও মেরে নিয়েছেন বলুন। আমার এই নিয়ে বারো বচ্ছর এখানে সার্ভিস হয়ে গেল, ঢুকেছিলুম কুড়িতে, এখন পাচ্ছি চল্লিশ টাকা করে। তা মশাই উশুলও ক'রে নিচ্ছে তেমনি; প্রথমে শুধু বাঙলা পড়াবে বলে এনেছিল, এখন ইংরিজি, হিন্দি, সংস্কৃত—সবই চালাতে হচ্ছে। এই যে নকুল ছোকরা বারো টাকায় ঢুকেছিল, ছ' বচ্ছর বাদেও একের কোঠা ছাড়াতে পারেনি,—সব শুদ্ধ আঠারো টাকা পাচ্ছিস এখন তুই না রে নকুল?'

উঠে গিয়ে শশিপদ আবার পানের পীচ রাস্তায় ফেলে এল! 'কী বলব মশাই, চামার। এত কম টাকায় কোয়ালিফায়েড লোক পাচ্ছিস, সে জন্যে কৃতজ্ঞতা আছে? কিছু না। আমার লেখা-টেখার হাত ছিল মশাই। বিয়ের পদ্য লিখেছি কমসে কম পঁচিশ তিরিশটে। আমি লিখতে না জানলে ওদের কত 'উপহারে'র খদ্দের ফিরে যেত, সে খেয়াল করেছে কোন দিন? কমিশন দিয়েছে? এক পয়সা না। প্রভাকর বড়াল সেদিকে বড়ো সেয়ানা। সেয়ানাই বা বলি কী করে, ওদিকে যে কম্পোজিটারগুলো দু'হাতে চুরি করছে, করতে পারছে কিছু? কাগজে চুরি, কালিতে চুরি, ইস্টিকে চুরি, স্পেসিং-এ চুরি—সব চোখ খুলে শুধু দেখে যাই মশাই। চুপ ক'রে থাকি।'

হেড কম্পোজিটার নিবারণ এসে তাড়া দিলে, 'তখন থেকে যে শুধু গল্পই করছেন মশাই, প্রুফের তাড়া যে এদিকে জমে গেল। বিকেলে এগুলোর ডেলিভারি দিতে হবে, খেয়াল আছে?'

হঠাৎ চুপ করে গেল শশিপদ। চশমা ঠিক ক'রে নিয়ে ঝুঁকে পড়ল টেবিলের ওপর। নকুলকে তাড়া দিয়ে বলল, 'হাঁ করে দেখছিস কী। কপি-গুলো গুছিয়ে নে। ধর ঠিক ক'রে।'

নিবারণ চলে যেতে, আড়চোখে তাকিয়ে চাপা গলায় বলল, 'এই একটি সাংঘাতিক লোক মশাই। কর্তা ওর কথায় ওঠেন বসেন। এখানকার সব কথা উনি দশখানা ক'রে ওখানে গিয়ে লাগান। এসেছেন যখন, দু'দিন সবুর করুন, দেখবেন সব।'

মুখে যাই বলুক, শশিপদর চোখে মুখে যে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল, তাতে ইন্দ্রজিতের বুঝতে বাকি রইল না যে মনে মনে সে নিবারণকে ভয় করে।

বেলা ঠিক চারটের সময় শশিপদ উঠে দাঁড়াল। ঘরের কোণ থেকে একটা ছেঁড়া ছাতা তুলে নিয়ে বলল, 'চলি। আপনি উঠছেন কখন?'

ইন্দ্রজিৎ বলল, 'প্রভাকরবাবু তো এখানো ফিরলেন না। প্রথম দিন যাবার সময় ওঁকে বলে যাওয়াই ভালো না?'

প্রভাকরবাবু প্রায় সন্ধ্যার আগে আগে এলেন। ব্যস্ত মানুষ, সব কাজ দেখে শুনে নিয়ে ইন্দ্রজিৎকে নজর করতেই প্রায় মিনিট কুড়ি কেটে গেল।

'এই যে আপনি এখনো আছেন। কেমন লাগল কাজকর্ম?'

'ভালোই তো।' ইন্দ্রজিৎ কৃতার্থ হাসতে চেষ্টা করল।

'লাগবেই তো, কাজে মন থাকলেই ভালো লাগে। ফাঁকিবাজদের দলে ভিড়বেন না, তা হলেই উন্নতি করতে পারবেন।'

পরদিন ইন্দ্রজিৎ সামান্য একটু দেরি করেই এল। ছাপাখানা ইতিমধ্যেই খুলেছে। শুনলে প্রভাকরবাবু এসে আবার বেরিয়ে গেছেন। শশিপদরা কেউ তখনো আসেনি। নির্দিষ্ট আসনটিতে গিয়ে বসল।

একটু পরেই একটা ছোকরা এসে কতকগুলো প্রুফ টেবিলের ওপর রেখে গেল। মিনিট পাঁচেক পরেই নিবারণ এসে এদিকে ওদিকে চেয়ে বলল, 'আরে, এগুলো এখনো পড়ে রয়েছে? শশিপদবাবু আসেননি বুঝি? কী মুস্কিল। ও মশাই, আপনি পারবেন এগুলো পড়ে দিতে? তাড়াতাড়ি করবেন,—
—এ ঘণ্টার মধ্যেই এগুলো ফাইনাল ক'রে পাঠাতে হবে।'

ইন্দ্রজিৎ ভয়ে ভয়ে প্রুফগুলো হাতে নিয়ে বসল। কাজ শুরু ক'রে দেখল, তেমন শক্ত নয় কিছু। চিহ্নগুলো জানাই আছে, পড়ে পড়ে যথাস্থানে বসিয়ে যাওয়া!

পড়া সারা হতে মিনিট পোনেরোর বেশি লাগল না। ঘরে এসে দেখে নিবারণ মহা খুশি। 'হয়ে গেছে? এই রকম চটপট কাজই তো চাই। আমাদের শশিপদ হলে ঘণ্টা দুই লাগিয়ে দিত।'

প্রায় এগারোটা নাগাদ শশিপদ হেলতে দুলতে এল। কোঁচার খুট দিয়ে কপালের ঘাম মুছল; ছাতা দিয়ে বসবার জায়গা আর টেবিলটা ঘষে পরিষ্কার ক'রে বলল, 'প্রুফ আসেনি?'

'এসেছিল', ইন্দ্রজিৎ কুণ্ঠিত হেসে বলল, 'আমি পড়ে দিয়েছি।'

'পড়ে দিয়েছেন?' বিস্মিত চোখে তাকাল শশিপদ; খুশি হল কি না বোঝা গেল না। 'আপনি বুঝি অনেকক্ষণ এসেছেন? খুব কাজ দেখাচ্ছেন?'

'কাজ আর কী; এসে পড়েছিল তাই—'

'তাই আর সবুর করতেও পারলেন না? আরে মশাই, অমনধারা কাজ আমরা আগে কত দেখিয়েছি। ওতে কিস্সু হয় না, দাদা, কিস্সু না। মালিক কাজ না পেলে চটে, কিন্তু কাজ পেলে খুশি হয় না। এ-সব শিখতে আপনার অনেক সময় লাগবে।'

খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে শশিপদ হঠাৎ নিচু সুরে বলল, 'প্রভাকর বড়াল আপনাকে বুঝি খুব সকাল সকাল আসতে বলেছে মশাই?'

'না তো। সেরকম বাঁধাধরা সময়ের কথা কিছু বলেননি।'

'বলেছে মশাই, বলেছে।' মিট মিট ক'রে হেসে শশিপদ বলল, 'আপনি ভাঙতে না চাইলে কী হয়। আমি বুঝতে পারি। কম টাকায় বেশি কাজ চাইছে। দু'দিন বাদে কোন একটা ছুতোয় আমাকে সরিয়ে দেবে। ও ঘুঘুকে আমি চিনি না? পঁয়তাল্লিশ বছর বয়স হল, কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে শেষ পর্যন্ত পথে দাঁড়াতে হবে দেখছি।

খানিক পরে নিবারণ ইন্দ্রজিতের দেখা একটা প্রুফ হাতে নিয়ে ফিরে

দেবার সিস্টেম তো আমাদের নেই। তা ছাড়া আপনি তো মোটে তিনদিন কাজ করছেন। সে যাই হোক, চেয়েছেন যখন, তখন বিশেষ প্রয়োজন আছে ধরেই নিচ্ছি। পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার ক'রে বললেন, 'আপনি নতুন লোক তাই পেলেন। কিন্তু এটাকে একটা precedent বলে ধরে নেবেন না যেন। মনে করুন, আমি আপনাকে ধার দিলাম। এ্যাডভান্স নেবার অভ্যাসটা ভারি খারাপ মশাই।'

প্রভাকর চলে যেতে শশিপদ পাশে এসে ঝুঁকে পড়ল। 'দিলে? কত মশাই?'

'দশ টাকা।'

শশিপদ ইন্দ্রজিতের পিঠ চাপড়ে দিল বটে, কিন্তু ঈর্ষাক্লিষ্ট স্বরে বলে যেতে লাগল, 'আপনার ওপর নজর ভালো আছে বলতে হবে। আমার ছেলেটার টাইফয়েড হয়েছিল, কান্নাকাটি ক'রে এক পয়সা অগ্রিম পাইনি।'

পায়ের জুতো ছিঁড়ে এসেছিল। ইন্দ্রজিৎ একজোড়া স্যাণ্ডাল কিনলে। দোকান থেকে বেরিয়ে আসছে, হঠাৎ শো-কেশের দিকে নজর পড়ে গেল। মখমলের ওপর রেশমি কাজ করা নরম একজোড়া চটি ক'দিন থেকেই দেখেছিল। নীলার পায়ে জুতো নেই। লোভ হল, কিন্তু দাম দেখল সাড়ে চার টাকা। এই কটা টাকাই সম্বল, চট্ ক'রে কোন সিদ্ধান্ত করতে পারল না, খানিক দূরে এসে শেষ পর্যন্ত ফিরেই গেল। দোকানীকে বলল চটিজোড়া বার করতে। আন্দাজে যতদূর বুঝল, নীলার পায়ে লাগবে। ওর জন্যে এত করেছে নীলা, এ তো সামান্যই। কর্তব্য। নীলা কতখানি খুশি হবে, সেটা কল্পনা করতে করতে গলির মুখে পৌঁছে গেল। পকেটে আর গোটা দুই টাকা বাকি। পঁচিশটে টাকার দশটা এরি মধ্যে ফুরিয়ে গেল।

বড়ো কম টাকা ইন্দ্রজিৎ ভাবল, নতুন ক'রে জীবন গড়তে চায়, কিন্তু মোটে পঁচিশটে টাকার ভিত্তি।